কাজী নজরুল ইসলামের গানে লোকসুরের ব্যবহার

মৃদুলা সমদ্দার
এম.ফিল. গবেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মে ২০২২

CamScanner

কাজী নজরুল ইসলামের গানে লোকসুরের ব্যবহার

USE OF FOLK TUNE IN THE SONG OF KAZI NAZRUL ISLAM

গবেষক

মৃদুলা সমদ্দার

রেজিষ্ট্রেশন নংঃ ৮৫

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৩-২০১৪

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মহসিনা আক্তার খানম

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ‘কাজী নজরুল ইসলামের গানে লোকসুরের ব্যবহার (Use of Folk Tune In The Song of Kazi Nazrul Islam)’ শীর্ষক বিষয়ের উপর অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি এর আগে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি।

মৃদুলা সমদ্দার
রেজিষ্ট্রেশন নংঃ ৮৫
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৩-২০১৪
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মৃদুলা সমদ্দার উপস্থাপিত 'কাজী নজরুল ইসলামের গানে লোকসুরের ব্যবহার (Use of Folk Tune In The Song of Kazi Nazrul Islam)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। তার এম ফিল শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-২০১৪ এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৮৫। এটি লেখকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেননি।

ড. মহসিনা আক্তার খানম
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি প্রথমেই নতশিরে কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের রূপকার ড মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী স্যারের প্রতি, যে মানুষটি না থাকলে আমার মত আরও অনেক শিক্ষার্থী দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগীত বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা এবং গবেষণার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মহসিনা আক্তার খানম ম্যাডামের প্রতি, তাঁর অনুপ্রেরণা এবং গুরুত্বপুর্ন পরামর্শের জন্য। ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী ম্যাডাম সহ সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই সহযোগীতা এবং অনুপ্রেরণার জন্য। আমি আজীবন কৃতজ্ঞ আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা, বাবার কাছে, যাদের অনুপ্রেরণায় সংগীত কে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। সংগীত নিয়ে এই পথ পরিক্রমাকে ক্রমশ সহজ করে দেবার জন্য আমার সহধর্মী এবং পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ গবেষণাকর্ম থেকে যদি কাজী নজরুলের লোকসুরের গানের সামগ্রিক দিক সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাওয়া যায় এবং পাঠক কিছুমাত্রও উপকৃত হন তাহলেই আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

মৃদুলা সমদ্দার
এম.ফিল গবেষক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

সার সংক্ষেপ

কাজী নজরুল ইসলামের গান বাংলা সংগীতে এক অসামান্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংযোজন। শিল্পকলার এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়না। সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, নাট্যকার প্রতিটি ভূমিকায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সংগীতে নজরুলের গানের মধ্য দিয়ে নতুন এক ধারার সূচনা হয়েছে। নজরুল বাংলা গানের প্রায় সব ঘরানাতেই গান রচনা করেছেন। তাঁর সংগীত প্রতিভা রাগসংগীতানুগ হলেও আধুনিক, ভক্তিরসাত্মক, দেশাত্মবোধক থেকে শুরু করে বাংলার প্রানের সুর লোকসুরেও তিনি গান রচনা করেছেন অসামান্য দক্ষতায়।

তাঁর রচিত লোকসুরের গানগুলো মর্মস্পর্শী, প্রবাহমান বাংলার রূপ প্রতিফলিত হয়েছে প্রতিটি গানে। কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত সৃষ্টির সময়কাল ১৯২০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। শুধুমাত্র এই ২২ বছরে একজন মানুষ কত বিচিত্র, কত ব্যাপক পরিসরে একটির পর একটি সৃষ্টিকর্ম করে গেছেন তা কল্পনার অতীত। তাঁকে এবং তাঁর সৃষ্টির অধ্যয়নের কোন শেষ নেই যেন। শিল্পের প্রতিটি আঙ্গিকে তাঁকে নতুন নতুন রূপে আবিষ্কার করা যায়। এই গবেষণাকর্মের আলোচ্য বিষয় কবি রচিত নজরুলের লোক সুরের গান। কবির অন্যান্য ধারার গানের মত লোকসুরের গানগুলোও সমানভাবে সাংগীতিক বৈচিত্র্যমন্ডিত। তাঁর গানের বিষয়বস্তুতে দেশকালপাত্র-ভেদে সমাজের বিচিত্র ধারার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। মানবজীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহের বিচিত্র রূপ এসব গানে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। লোকজীবনবোধ, ভূমি ও প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্কিত এ গান বাংলা সংগীতের চলমান ধারাকে পরিপূর্ন করেছে। লোকসুরে রচিত নজরুলের গান সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও এসব গান মূল সুর এবং গায়কী অনুসরন করে গাওয়া হলে শ্রোতামহলে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে।

আমার গবেষনাকর্মের মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের লোকসুরের গানের সামগ্রিক রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও লেখনী দ্বারা পাঠক এবং নজরুল প্রেমীরা বিন্দুমাত্র উপকৃত হলে এ চেষ্টা সার্থক হবে।

সূচিপত্র

ভূমিকা	**১-২**
প্রথম অধ্যায়	
লোকসংগীতের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ	৩-১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
কাজী নজরুল ইসলাম রচিত লোকসুরের গানঃ	
প্রেক্ষাপট, সুরবৈচিত্র্য এবং বিষয়বৈচিত্র্য	১৪- ৪১
তৃতীয় অধ্যায়	
বিভিন্ন মাধ্যমে নজরুলের লোকসুরের গানের বিকাশ	
(গ্রামোফোন, বেতার, নাটক, চলচ্চিত্র)	৪২ -৫৪
চতুর্থ অধ্যায়	
লোকসুরে নজরুলের গানের রূপকার	৫৫ - ৬০
উপসংহার	**৬১**
পরিশিষ্ট- ১	
কাজী নজরুল ইসলাম রচিত লোকসুরের গানের তালিকা	৬২- ৭৩
পরিশিষ্ট-২ কতিপয় গানের স্বরলিপি সংযুক্তি	৭৪-১০৯
সহায়ক গ্রন্থসমূহ	১১০

CamScanner

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের বিবর্তনের ধারায় এক সব্যসাচীর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি বাংলা গানকে দিয়েছেন অসাধারন বৈচিত্র্যময়তা। বিষয় বৈচিত্র্য এবং সুরশৈলীর ভিন্নতায় বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। বাংলা গানের প্রায় সকল ধারাতেই তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। উচ্চাঙ্গ সংগীত থেকে শুরু করে আধুনিক, ভক্তিমুলক, দেশাত্মবোধক, লোকসংগীতানুগ সহ প্রায় সব আঙ্গিকেই তিনি গান রচনা করেছেন।

লোকসংগীত বাংলার নিজস্ব সংগীতশৈলী। বাংলা গানের প্রাচীন যুগ থেকে লোকসুরের ব্যবহার হয়ে আসছে। বঙ্গভঙ্গের সময় লোকসুরে স্বদেশী গান রচনার একটি প্রবণতা তৈরী হয়, বিশেষ করে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসুর অবলম্বন করে গান রচনা করেন, তখন থেকেই শ্রোতা ও নাগরিক সংস্কৃতিবান সংগীতকারদের মধ্যে লোকসুরের প্রতি অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি হল এবং ক্রমেই এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকল। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য রচিয়তা ও সংগ্রাহকদের মাধ্যমে লোকসংগীত সর্বজন সমাদৃত হতে থাকল। গ্রামোফোন, বেতার, সবাকচিত্র প্রভৃতি মাধ্যমে লোকসংগীত ক্রমশ প্রচারিত হতে থাকল।

নজরুলের জন্মভূমি চুরুলিয়ার একদিকে বীরভূমের সীমান্ত এবং অন্যদিকে সাঁওতাল পরগনার অনুচ্চ পাহাড়। বীরভূমের বাউল সুর, সাঁওতালী ঝুমুরের উন্মাদনা, বর্ধমানের লেটো-ভাদুর সুর তাঁকে প্রানচাঞ্চল্যে ভরিয়ে রেখেছে শৈশব থেকেই। লেটো গানের দলে যোগদানের মাধ্যমে কৈশোরেই নজরুল লোকসংগীতের ভুবনে প্রবেশ করেন। নজরুলের সংগীত প্রতিভা মূলত রাগসংগীতানুগ হলেও লোকসুরে রচিত তাঁর গানগুলো সমান যুগোপযোগী এবং সংগীতিক ব্যঞ্জনায় অনবদ্য।

বাংলার লোকসংস্কৃতির সম্ভার তাঁর গানের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। ঝুমুর, ঝাঁপান, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, সারি প্রভৃতি সুরে নজরুল লোকসংগীত রচনা করেন। নজরুলের লোকসুরের গান রচনার প্রেক্ষাপট, সুরবৈচিত্র্য, ব্যাপকতা প্রভৃতি বিষয় এ গবেষনাকর্মে সন্নিবিষ্ট করা হল। বাংলার আদিসুর হল লোকসুর। ঐতিহ্যগতভাবেই বাংলা গান লোক সুরভিত্তিক। কীর্তন, বাউল, শ্যামা সংগীত, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর প্রভৃতি বাংলার লোকসুরের নিদর্শন। নজরুলের লোকসুরের গানগুলোতে এ সকল ধরনের সুরের সমন্বয় ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার এই গবেষণা কর্মে কাজী নজরুলের লোকসুরের গান সম্পর্কে সামগ্রিক একটি আলোচনার চেষ্টা করেছি। তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেছি। বাংলা একাডেমীর অভিধান অনুযায়ী আধুনিক বানান রীতি অনুসরন করা হয়েছে এই গবেষণা পত্রে।
মোট চারটি অধ্যায়ে গবেষণাটি করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে লোকসংগীতের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং প্রকারভেদের আলোচনা করে লোকসংগীতের সামগ্রিক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত লোকসুরের গানের আঙ্গিক, সুর ও বানীবৈচিত্র্য সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রামোফোন, বেতার, নাটক, চলচ্চিত্র প্রভৃতি মাধ্যমে লোকসুরের গানের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নজরুলের লোকসুরের গান কণ্ঠে ধারন করে যারা শ্রোতার কাছে জনপ্রিয়তা এনেছেন সেইসব গুণী শিল্পীদের সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

পরিশিষ্ট -১ এ নজরুল রচিত লোকসুরের গানের একটি তালিকা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পরিশিষ্ট -২ এ কিছু লোকসুরের গানের স্বরলিপি সংযুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

লোকসংগীতের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

বাঙালি সংগীতপ্রিয় জাতি, সংগীতের মধ্য দিয়েই বাঙালির সার্থক পরিচয় ফুটে ওঠে। সবুজ শ্যামল প্রকৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য এবং ঐতিহাসিক পটভূমি এদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। লোকসংগীত বাংলার চিরায়ত সংগীতধারা। 'লোক' শব্দের অর্থ জনসাধারন বা ব্যক্তি এবং 'সংগীত' শব্দের অর্থ গীতি বা গান। সুতরাং লোকসংগীত বলতে জনসাধারনের মুখে মুখে প্রচলিত গানকেই বোঝায়। হৃদয় ও অনুভূতি থেকে এ গান সৃষ্ট। যে কোন সংগীতের মতই বানী ও সুরের সমন্বয়ে সৃষ্ট হয় এ সংগীত। লোকসংগীতের বানীর ভাষা আঞ্চলিকতায় পরিপূর্ন এবং সুরও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। লোকসংগীতে থাকে মাটি ও মানুষের স্পর্শ। বাংলার চিরায়ত সমাজ, সংস্কৃতি, বাঙালির জাতীয়তা, দৈনন্দিন জীবনাচার, বিনোদন, জীবনের জয়-পরাজয়, কান্না-হাসি, সুখ-শান্তি, প্রশান্তি, পার্থিব-অপার্থিব মতাদর্শ, মনন চর্চা ও জীবন দর্শনের যাবতীয় ইতিবাচকতা, প্রেরণা, আকুতি, জীবনের চালচিত্রের সার্বিক পরিচয় হল লোকগীতি। বাংলা সংগীতের নিজস্ব ঐতিহ্য লোকগীতি। লোকগীতিতে রয়েছে বাংলার মানুষের প্রানের স্পন্দন। এ গান বংশ পরম্পরায় এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের মুখে মুখে, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে প্রবাহিত হতে থাকে। সাধারনভাবে লোকগীতি অর্থ বহুকালব্যাপী জনগনের মধ্যে জনগনের দ্বারা লিখিত স্বতঃপ্রনোদিত সুরে মুখে মুখে প্রচারিত গান। লোকগীতি ব্যক্তি দ্বারা রচিত হতে পারে,আবার অলিখিতও হতে পারে। একটি গতিশীল ও সংহত সমাজে যে কোন সময়েই লোকগীতি সৃষ্টি হতে পারে।

লোক গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে -

'যাহা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোক সমাজ কর্তৃক মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোকগীতি বলে।'[১]

ফোকলোর বিদ Alexander H. Krappe বলেন-

'The folk song is individual authorship in the sense that it was first that composed bz one individual, sometimes a known literarz figure, sometimes a man of the people whose name has remained obscure'[২]

বিশিষ্ট লোকসংগীত বিশারদ মুস্তাফা জামান আব্বাসী বলেছেন,

‘লোকের মুখে মুখে যে গান ঘুরে বেড়ায়, যার লিখিত রূপ নেই, যা বংশ পরম্পরায় গীত হয়ে এসেছে, গীতিকার ও সুরকারের পরিচয় যেখানে অবলুপ্ত, যার গায়কীতে আছে এমন একটি বিশেষ বিশেষ রূপ যা তার নিজস্ব তাকেই লোকসংগীত বলা যায়।’[৩]

প্রখ্যাত লোকগীতি বিশেষজ্ঞ ও গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে-

‘ব্যক্তি সৃষ্ট গানেও যদি লৌকিক সুর ও রচনাভঙ্গি অপরিবর্তিত থাকে আর তা যদি লোকের মনকে আলোড়িত করে এবং জনগন যদি তা নিজের বলে গ্রহণ করে তাহলে তা লোকগীতির পর্যায়েই পড়বে। কারন এটি লোকগীতি পরিবর্তনেরই একটি স্বাভাবিক ধারা।’[৪]

কবি জসীম উদ্দীনের ভাষ্যমতে-

‘লোকগীতির সংজ্ঞা এই যে, ইহার কথা ও সুর দিনে দিনে পরিবর্তিত হইয়া চলে। তাই ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের রচনা নয় ইহা, সমগ্র জাতির রচনা।’[৫]

বাংলার সংস্কৃতি এর প্রকৃতির মতই সহজ সরল। সবুজ বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ষড়ঋতুর সমাহার, নদীমাতৃকতা, আবহাওয়ার প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীলতা এদেশের মানুষের মানস গঠনে সহায়ক ভুমিকা রেখেছে। সংস্কৃতির একটি মুল উপাদান সংগীত। লোকসংগীত বাংলার মানুষের প্রানের স্পন্দন। বাঙালির কাছে এর আবেদন চিরায়ত। গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পরিবেশে এ গান সৃষ্ট এবং গ্রামীণ লোকশিল্পীদের দ্বারাই পরিবেশিত হয়। লোকগাঁথা, লোকদর্শন, লোকজীবনধারা এবং সমাজচিত্র প্রকাশ পায় এ গানে। বাংলা ও বাঙালীর চিরকালের গ্রামীন জীবনের আকুতি, জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি ও পরিবেশ, চিরায়ত বাংলার রূপ এবং বাঙালীর জীবন চেতনা নিয়ে যে সংগীত বহুকাল ধরে রচিত এবং গীত হয়ে আসছে, তাই লোকসংগীত। এ গান জনমানুষের একান্ত আপন, আমজনতার মধ্যে সর্বজনবোধ্য, সর্বজন আন্দোলিত মুখে মুখে প্রচারিত গান। এর সুর এবং বাণীতে রয়েছে লোকমানসের প্রতিফলন ও সমাজের প্রতিচ্ছবি।

লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য

লোকসঙ্গীত স্বল্পশিক্ষিত লোকসমাজে সৃষ্ট গান। মৌখিকভাবে এসব গানের সম্প্রসারন ঘটেছে । অলিখিত হওয়ার কারনে মানুষভেদে বা অঞ্চলভেদে একই গান সুর ও বানীর দিক থেকে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। মুখে মুখে রচিত হলেও লোকসংগীত পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ঋতুবৈচিত্র্য, নীলাকাশ, জনমানুষের জীবনগাঁথা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। প্রাগৈতিহাসিক মানব সমাজে লোকসঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছে।

এসব গান বানী ও সুরে আঞ্চলিক প্রভাবযুক্ত। আঞ্চলিকতা এ গানের মুল নিয়ামক শক্তি। অঞ্চল বিশেষের গণসংস্কৃতির প্রভাব, ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, আর্থসামাজিক অবস্থা, শ্রমজীবন, কৃষি জীবন, শ্রেণীসংঘাত, জীবিকা নির্বাহের উপায়সমূহ, লোকজীবনের চালিকাশক্তি লোকগীতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। কতগুলো স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সংহতভাবে বসতি গড়ার জন্য এক এক অঞ্চলে এক এক ধারার লোকসংস্কৃতি অঞ্চলভেদে ভিন্নতা পেয়েছে।

লোকগীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আঞ্চলিক উপভাষা। বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের মেলামেশা, জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমন্ডলের সৃষ্টি হয়। অনিবার্য কারনেই এক একটি ভৌগোলিক এলাকায় পৃথক পৃথক ভাষাগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। আঞ্চলিকভাবে গড়ে ওঠা এসব ভাষাকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা এবং ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় এর নাম হচ্ছে 'উপভাষা'। যে সমাজ ও পরিবেশ থেকে লোকগীতির উদ্ভব তা অবশ্যই সেই সমাজ বা অঞ্চলের নিত্য ব্যবহার্য ভাষা ও শব্দ ভান্ডার দিয়ে সৃষ্ট। লোকগীতির অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে জনমানুষের গ্রহনযোগ্যতা। যেকোন একটি অঞ্চলের লোকগীতিকে সেই অঞ্চলের মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্যতা পেতে হবে, স্বীকৃত হতে হবে। এই গান অবশ্যই সাধারনের বোধগম্য হতে হবে এবং আম জনতার কাছে সার্বিক আবেদন রাখতে সমর্থ হবে।

লোকগীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম একটি দিক হল সরলতা। সহজ সরল প্রানের অনুভূতি, সহজ ভাষা, মানবিক অনুভূতি ও সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গি হল লোকগীতির মূল প্রতিপাদ্য। সারল্যের মধ্যেও এসব গানে প্রকাশ পায় কবির আধ্যাত্মিক জীবনবোধ ও গভীর অনুভূতি,মানবিক চিরন্তন ভালবাসা, সামাজিক বঞ্চনা ও শোষনের চিত্র। লোকগীতির মধ্যে ফুটে ওঠে জনজীবনের প্রতিচ্ছবি। প্রাধান্য পায় উৎসব, উদযাপন,পার্থিব ও অপার্থিব জীবন,আচার-অনুষ্ঠান,ধর্মীয় জীবন,জীবিকা নির্বাহের চিত্র প্রভৃতি নানা রকমের মানবিক প্রয়োজন।

স্বভাবদক্ষতা লোকসংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ গান অনুশীলনের প্রয়োজন হয়না, কানে শুনে মুখে মুখে এ গান প্রচারিত হয়।

পরিবর্তনশীলতা লোকসংগীতের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন রূপ ত্যাগ করে যুগোপযোগী বিষয়বস্তুকে গ্রহন করাই এ গানের ধর্ম।

লোকগীতি মিলিত কণ্ঠের গান। ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিগত রচনা এবং গায়নরীতি এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে।

অনেক লোকগীতির একান্ত সহযোগী হচ্ছে নৃত্য। এ গানে নৃত্য ও গীত দু'টোরই সমন্বয় ঘটে । আদিম সমাজ থেকেই লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ এ গায়নরীতি।

বাংলার অধিকাংশ লোকগীতিতে ধর্মের ভাব সুস্পষ্ট। লোকমানুষের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, প্রথা, কুসংস্কার, লৌকিক বিশ্বাস, অলৌকিক কাহিনী, বহুকালের অর্জিত সংস্কার লোকসংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

লোকসংগীত গ্রামীণ জীবনসংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। বেঁচে থার জন্য সংগ্রামের নামই জীবন আর এর প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে লোকসংগীতে।

পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য লোকগীতির মধ্যে অন্যতম। এ গানে সাধারনত দুই ধরনের পরিবেশ প্রকাশ পায়। একটি প্রাকৃতিক, অন্যটি সাংস্কৃতিক। সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব যেমন লোকসংগীতির মধ্যে সুস্পষ্ট, ঠিক তেমনই প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেমন-জলবায়ু, দুর্যোগ, উদ্ভিদ, জন্তু, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমুদ্র, হাওড়-বিল, ঝড়-বৃষ্টি এবং প্রকৃতি সৃষ্ট যে কোন রকমের অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় এসব গানে।

এছাড়াও সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রা, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন কৌশল, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয়ও প্রকাশ পায় লোকগানের কথা ও সুরে। লোকগীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম একটা দিক হচ্ছে পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন রূপ ধারন করা। প্রাচীন রূপ ঝেড়ে ফেলে যুগোপযোগী রূপ ধারণ করা এর স্বভাব। জনশ্রুতিমূলক গান লোকসংগীত, মুখে মুখে এ গান প্রচারিত হয়। স্বভাবদক্ষতাও এ গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

লোকাচার, লোকধর্ম, লোকসমাজ, লোককথা এসবকে উপজীব্য করেই লোকসংগীত রচিত হয়েছে। বাংলার লোকগীতির আবেদন সার্বজনীন, সংগীতের এই বিশাল ও বিচিত্র ভান্ডার বাংলাকে পরিচিত করে চলেছে বিশ্বদরবারে।

লোকসংগীতের প্রকারভেদ

একটি দেশ বা গোষ্ঠীর জাতীয় জীবনের কর্মকান্ড এবং মানুষের জীবনধারার বহিঃপ্রকাশই সেই দেশের লোকসংস্কৃতি। বাংলার লোকসংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রকাশ ফুটে ওঠে লোকসংগীতে। এদেশের লোকসংগীত অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ন। শ্রেণীবিন্যাস করার জন্য লোকগীতিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ভাবে লোকসংগীতের শ্রেণীকরণ করা হয়। বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে এবং মতাদর্শ অনুসারে বিভিন্ন আঙ্গিকে লোক সংগীতের শ্রেনীবিন্যাস করা হয়। আবার লোকসংগীতের বিষয়বস্তু, পরিবেশগত কারন এবং সময়কাল অনুসারেও এর শ্রেনীবিন্যাস করা হয়ে থাকে। আবার লোকসংগীতের শ্রেনীবিন্যাস করতে গিয়ে

বিভিন্ন মতামত তৈরী হয়েছে। এ পর্যায়ে কয়েকজন লোকগবেষকের মতামত অনুযায়ী লোকসংগীতের শ্রেণীবিন্যাসের একটি ধারনা পাওয়া যেতে পারে।

প্রখ্যাত লোক গবেষক চিত্তরঞ্জন দেবের মতানুসারে লোকসংগীতকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১। 'বারোমেসে'- এ পর্যায়ের গান গাওয়ার নির্দিষ্ট সময় নেই। বছরের যে কোন ঋতুতে এবং যে কোন দিনে গাওয়া হয়।

২। 'সাময়িকী'- কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা পার্বনকে কেন্দ্র করেই গাওয়া গান এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৩। 'অকস্মাৎ'- এ সকল গান অকস্মাৎ কোনো প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এবং গীত হয়।[৬]

লোক গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য গানের তালভেদে লোক সংগীতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১। যে গানের তাল আছে - তালময় গানের সাথে কোন না কোন কাজের সম্পৃক্ততা থাকে তাই একে সক্রিয়সংগীত বলা যেতে পারে।

২। যে গানের তাল নেই- তালহীন গানকে অবসরের গানও বলা যায়।

আবার ড. ভট্টাচার্য বিষয়বস্তুগত দিক থেকে লোকসংগীতকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছেঃ

১। আঞ্চলিক

২। পারিবারিক

৩। আনুষ্ঠানিক

৪। কর্মসংগীত ও

৫। প্রেমসংগীত।[৭]

এসব পর্যায়ের গান সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলঃ

আঞ্চলিক

এক একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রচিত হয় এধরনের লোকসংগীত। গানগুলোর মাধ্যমে একটি অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়। একই সাথে সেই অঞ্চলের সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান সহ সামগ্রিক একটি চিত্র প্রকাশ পায়। এ ধরনের গানের মধ্যে রয়েছে ভাটিয়ালি গান, বিচ্ছেদ গান, জারী গান, সারি গান, ঘেঁটু গান, বারোমাসী গান, পালাগান, বাউল গান, দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান, মুর্শিদী গান, চিঁড়ে কোটার গান, ধানভানার গান ইত্যাদি। যেমনঃ ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত। উত্তরবঙ্গের

রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এ গান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের বিষয়বস্তু মূলত প্রেম হলেও বিরহ ও বিচ্ছেদের ভাব এ গানে ফুটে ওঠে। একটি ভাওয়াইয়া গানের উদাহরণঃ

'ও কি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চাইয়া রে'

আঞ্চলিক গানের মধ্যে ঘাটু গানের উদাহরন টানা যেতে পারে। ঘাটু বা ঘেঁটু গান প্রধানত নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ এবং সিলেটের হাওড় অঞ্চলে প্রচলিত এক ধরনের নৃত্যসংগীত। নৌকার ওপর কিশোর বা কিশোরীর নাচের সঙ্গে এ গান পরিবেশিত হত। বর্তমানকালে এ গানের প্রচলন খুব একটা নেই বললেই চলে।

পারিবারিক

পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের উৎসব, অনুষ্ঠান, এমনকি দৈনন্দিন কার্যকলাপের অংশ হিসেবে যেসকল গান গাওয়া হয়, সেই সকল গানই পারিবারিক বিনোদনমূলক লোকসংগীত। গ্রামাঞ্চলে যেকোনো পরব বা উৎসবে গান একান্ত সঙ্গী। এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে গর্ভধারনের গান, সাধভক্ষনের গান, বিবাহ-সংগীত, ধামাইল গান, মেয়েলী গান প্রভৃতি গানের। পারিবারিক কিছু অনুষ্ঠানের গান এ পর্যায়ে তুলে ধরা হল-

অধিবাসের গান

সাধারনত গ্রামাঞ্চলে বিয়ের আগের দিন অধিবাস অনুষ্ঠানে এ ধরনের গান গাওয়া হয়। বিয়েবাড়িতে মহিলারা একত্র হয়ে নতুন বউ বা বরকে ঘিরে এসব গান গায়। যেমনঃ

'আকাশে উঠিল তারা, অধিবাসের পড়ল সারা,
বল শুনি ও রোহিনী, অধিবাসের আয়োজন।
ভরি ঘট গঙ্গাজলে, সাজায়ে কদলী ফলে,
বর শীঘ্র অধিবাস, পুরইত রইছেন উপবাস।'

সাধভক্ষনের গান

গর্ভবতী মেয়েদের সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানে তাদের সাধ অনুযায়ী বিভিন্ন খাবারের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে যেসব গান গাওয়া হয় সেগুলোই সাধভক্ষনের গান। এসব গানের মাধ্যমে মা এবং অনাগত সন্তানের মঙ্গল কামনা করা হয়। যেমনঃ

‘লাউলোর বউ লো সাধান্তি

কি কি ঘাটতে সাধ?

ঘরে ছাঁইছে নলভোগ ছিম, তাই খাইতে সাধ।’

আনুষ্ঠানিক

গ্রামীন জীবনে যেকোন অনুষ্ঠানে সংগীত সর্বাগ্রে প্রাধান্য পায়। গান ছাড়া বাঙালির কোন অনুষ্ঠান পরিপুর্নতা পায়না। বিভিন্ন রকম পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেসব গান গাওয়া হয়ে থাকে সেসব গানকে আনুষ্ঠানিক গানের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমনঃ কীর্তন গান, গম্ভীরা, জারি গান, ধামাইল গান, ভাসান/রয়ানী গান, হোলীর গান, মেছোনি খেলার গান, মর্সিয়া গান, নৈলার গান, ভাদু গান, লেটো গান, কবি গান প্রভৃতি। আনুষ্ঠানিক গানের মধ্যে উদাহরন টানা যেতে পারে দু’টি গানের। যেমনঃ

ঘেটু গান

পশ্চিমবঙ্গের নদী অঞ্চল এবং বাংলাদেশের হাওড় অঞ্চলের বিলুপ্ত প্রায় একটি লোকসংগীতের ধারা হচ্ছে ঘেটু গান বা ঘাটু গান। ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে এই গান গাওয়া হত বলে এর নাম ঘেটু গান। একটি ঘেঁটু গানের উদাহরনঃ

‘ঘেঁটুর পুজা করবো আজি আয় সবে আয় তোরা

ঘেঁটু ফুলে সাজাবো ঘটতে-মাথা পথে মোরা।

ফাল্গুন সংক্রান্তি দিনে রাস্তাঘাট আর পথের কোনে

ঘেঁটুর পূজায় মাতলো সবাই আনন্দে হারা।’

কীর্তন গান

গ্রামাঞ্চলে কীর্তন জনপ্রিয় একটি পরিবেশনা। বিভিন্ন পুজা এবং ধর্মীয় উৎসবে প্রহরব্যাপী অষ্ট প্রহর, ষোল প্রহর, চব্বিশ প্রহরব্যাপি নাম সংকীর্তন অথবা পদাবলী কীর্তন পরিবেশিত হয়। যেমনঃ

‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে’ এই পদটি প্রহরব্যাপি নাম কীর্তনে গাওয়া হয়।

কর্মসংগীত

একটানা কাজের মধ্যে উদ্দীপনামুলক যেসব গান গাওয়া হয় সেসব গানকে কর্মসংগীত বলে। শ্রমিক, মজুর, মাঝি, গাড়িয়াল, কামার, কুমার প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার কর্মজীবিরা কাজের মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে আবার কখনও নিজের কাজকে আরও বেশি উদ্দীপনাময় করতে গানকে অবলম্বন করে। এসব গানই মূলত কর্মসংগীত হিসেবে পরিচিত। এ পর্যায়ে বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় গান আছে যা এখনও মানুষের মুখে মুখে সমাদৃত। এরকম কিছু গানের উদাহরন নিম্নোক্তঃ

'আয়রে মোরা ভুঁই নিরাইতে যাই।

ভুঁই মোগো মাতা-পিতা, ভুঁই মোর গো পুত।

ভুঁইর দৌলতে মোর গো আশী কোঠা সুখ।' কৃষি কাজ করার সাথে এ গানটি সম্পর্কিত।

কর্মসংগীতের মধ্যে আরেকটি গানের উদাহরন টানা যেতে পারেঃ

'নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া দে

ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া।'

নদীতে নৌকা চালানোর সময় মাঝিদের গান হিসেবে এ গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

প্রেমসংগীত

নরনারীর জীবনের প্রেমগাঁথা, সুখ-দুঃখ, বিরহ-আনন্দের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হয় এ ধরনের সংগীত। আবেগ, ভালবাসা, সহজ-সরল প্রেমকাহিনী এ ধরনের গানের বিষয়বস্তু। লোকসংগীতের মধ্যে এ পর্যায়ের গানগুলোই সংখ্যায় বেশি। লোকসংগীতের সহজ সরল সুরে এবং আবেগময় প্রকাশভঙ্গিতে এ ধরনের গান পূর্ণতা পায়। আলকাপ, গোসাগান, ঘাটুগান, ঝুমুর গান, ভাওয়াইয়া, মাহুত বন্ধুর গান, রাখালিয়া গান, সাম্পান মাঝির গান, বারোমেসে গান প্রভৃতি গান এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ ধরনের কিছু গানের উদাহরণ নিম্নোক্তঃ

ভাওয়াইয়া

ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত। সুরের ভাঁজে ভাঁজে প্রেমিকের করুন ও বিরহ ভাব ফুটে ওঠে এ গানে। একটি ভাওয়াইয়া গানের উদাহরন নিম্নোক্তঃ

'ও কি গাড়িয়াল ভাই-

কত রব আমি পন্থে'র দিকে চায়ারে।'

এ গানটি উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ভাওয়াইয়া গান।

ভাটিয়ালি

ভাটিয়ালি মূলত নদীনির্ভর সংগীত। এ গানে গায়কের একাকিত্ব, নিরাসক্ততা, হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ পায় ভাটির স্রোতের মত টানা সুরে। এরকম দু'টি গানের উদাহরন নিম্নোক্তঃ

'ত্রিভুবন ছাড়ি পিরীতির বীজ আনি
রোপিয়ে সিঞ্চিতে হ'ল তারে দিয়ে নয়নের পানি '

'এ ভব সাগরে কেমনে দিব পাড়ি রে
দিবা নিশি কান্দি রে নদীর কূলে বইয়া '

লোকসংগীত বিশারদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- "হিমালয়ের তরাই অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার মোহনা এবং আর একদিকে পূর্ববাংলার জলাভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে সীমান্ত বাংলার প্রস্তর ভূমি- সর্বত্র প্রাকৃতিক রূপ অভিন্ন নহে, ইহার এই বিচিত্র নৈসর্গিক রূপ ইহার লোকসংগীতের গীতি রীতির মধ্যেও বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।'[৮]

তিনি আঞ্চলিকতার ভিত্তিতেও লোকগীতিকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করেছেন।

১। রাঁঢ়- মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলা।

২। পশ্চিমবঙ্গ- হুগলী , হাওর, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শীদাবাদ জেলা।

৩। উত্তরবঙ্গ- উত্তর-পুর্ববঙ্গ অঞ্চল- মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, রংপুর জেলা, পশ্চিম শ্রীহট্ট, উত্তর ত্রিপুরা।

৪। দক্ষিন পুর্ববঙ্গ- নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম।[৯]

ড. ভট্টাচার্যের কয়েকটি আঙ্গিকের শ্রেণীকরণ থেকে বাংলার লোকসংগীতের বৈচিত্র সম্পর্কে বেশ অনেকটা ধারনা পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে লোকসংগীতের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে সুর, বিষয়বস্তু, পরিবেশ, আঙ্গিক, সংস্কৃতি, এলাকা বিভাজন প্রভৃতি অসংখ্য উপাদান বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এসব আঙ্গিকে প্রখ্যাত গবেষক ড. মুহম্মদ এনামুল লোকগীতিকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন।

১। প্রেমসংগীত- ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বারমেসে প্রভৃতি গান।

২। নৃত্যসংগীত- ঝুমুর, ভাঁজই, ঘাটু, লেটো প্রভৃতি গান।

৩। সহেলা- যাবতীয় মেয়েলী সংগীত প্রভৃতি গান।

৪। শ্রমসংগীত- সারি, বাইচ, ছাদপেটা প্রভৃতি গান।

৫। কৃষিসংগীত- জাগ, কার্তিকা, পুষালি প্রভৃতি গান।

৬। আনুষ্ঠানিক- গম্ভীরা, গাজন, ভাদু প্রভৃতি গান।

৭। পটুয়াসংগীত- দোপট, গাজীপট প্রভৃতি গান।

৮। শোকসংগীত- জারিগান, কান্নাগান প্রভৃতি গান।

৯। ভক্তিসংগীত- শক্তিসংগীত, সোনাপীর, মানিকপীর, বদরপীর, মাইজভান্ডারি প্রভৃতি গান।

১০। তত্ত্বসংগীত- বাউল, মুরশিদি, মারফতি, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি গান।[১০]

অন্যদিকে গবেষক ওয়াকিল আহমেদ লোকগীতির বিষয়, প্রকার, সম্ভাব্য অঞ্চল, ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের তালিকা সহ আনুমানিক ৫০ রকমের লোকগীতির একটি বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করেছেন। সংক্ষেপে এ তালিকা থেকে বাংলার লোকগীতির যে কয়টি প্রকারভেদ পাওয়া যায় সেগুলো এ পর্যায়ে তুলে ধরা হল- আলকাপ গান, ওন্নিগান, কবিগান, কীর্তন খেমটা, ক্ষেত নিড়ানির গান, গম্ভীরা, গাজন, গাজীর গান, গোসাগান, ঘাটুগান, চটকা, ছাদ পিটানোর গান, জাগ গান, জারি গান, ঝাঁপান, ঝুমুর, তর্জা, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, ধামালী, ধুঁয়া গান, নাটুয়া গান, নৈলা, বৃষ্টির গান, নৌকা বাইচের গান, টুসু, পুটুয়া, বাউল, বাঘাই শিরনির গান, বারোমাসি, বিচার গান, বিচ্ছেদের গান, বেদের গান, বৈঠকী গান, বোলান গান, ব্রতের গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ভাঁজো গান, ভাটু গান, রয়ানি গান, মর্সিয়া গীত, মাইজভান্ডারী গান, মাদারের গান, মানিক পীরের গান, মারফতি গান, মালসী, মাহুত গান, মৈষালী, মুর্শিদী গান, মেয়েলী গীত, যাত্রাগান, রাখালি, লেটো গান, সারিগান, হাতি খেদার গান, হোলির গান ইত্যাদি।[১১]

প্রকৃতপক্ষে বাংলা লোকসংগীতের সঠিকভাবে শ্রেনীবিন্যাস করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সহজ-সরল ভাবে লোকমুখে উচ্চারিত, গীত গানই লোকসংগীত। বাংলায় অঞ্চলভেদে বহুরকম মানুষের বসবাস এবং অসংখ্য বৈচিত্র্যের লোক সংগীতের সন্ধান আমরা পাই। বাংলার লোকগীতিতে সুরের, ভাবের, বিষয়ের এবং বঞ্চনার যে বৈচিত্র্য আছে, উপমহাদেশে আর কোনো অঞ্চলের লোকগীতিতে এত বৈচিত্র্য পাওয়া সত্যিই দুষ্কর।

টিকা ও তথ্য নির্দেশ

১। ড. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতিঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন* (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৭, পৃ. ২৮৯

২। *প্রাগুক্ত:* পৃ ২৯১

৩। ড. মাফরুহা হোসেন সেঁজুতি, *নজরুল সংগীতে লোকউপাদান*, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০১৭, পৃষ্ঠা-১৩২

৪। ড. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতিঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন* (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৭, পৃ. ২৯১

৫। *প্রাগুক্ত:* পৃ ২৯১

৬। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৩৭৫

৭। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৩৭৫-৩৭৬

৮। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৩৭৭

৯। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৩৮৮

১০। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৩৮৮-৩৮৯

১১। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৩৮৮-৩৮৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুলের লোকসংগীতানুগ গান রচনার প্রেক্ষাপট, সুর বৈচিত্র্য এবং বিষয়বৈচিত্র্য

লোকসংগীত বাংলার চিরন্তন সুর। আবহমান কাল হতে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনধারা, সমাজ, সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে রচিত এসব গান মুখে মুখে রচিত ও গীত হয়ে এসেছে। লোকসংগীত গ্রামবাংলার মানুষের প্রানের স্পন্দন। সাধারণত গ্রামীন জীবন এবং সংস্কৃতিকে ঘিরেই এর আবর্তন। বঙ্গভঙ্গ কালে জোড়াঁসাকোর ঠাকুরবাড়ী থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসুর অবলম্বনে স্বদেশী সংগীত রচনার পর থেকে বাংলার এই আবহমান সংগীতের প্রতি নাগরিক সংস্কৃতিবান সংগীত রচয়িতাগনের আগ্রহ সৃষ্টি হল। হিন্দুস্তানি সংগীতের পাশাপাশি বাংলার নিজস্ব সম্পদ লোকসুরে গান রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। গ্রামোফোন, বেতার, সবাকচিত্র প্রভৃতি মাধ্যমে লোকসংগীত ক্রমান্বয়ে শ্রোতৃহৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে এবং চলমান সময়েও আধুনিকতার সাথে লোকসংগীতের সার্থক পরিবেশনা বিদ্যমান।

আধুনিক বাংলা কাব্য সংগীতের পঞ্চভাস্কর হিসেবে সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম এই পাঁচজনের মধ্যে নজরুল জন্মেছিলেন বাংলার রাঁঢ় অঞ্চল চুরুলিয়ায়। ছোটবেলা থেকেই এ অঞ্চলের সংস্কৃতি নজরুলের মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নজরুলের জন্মভূমি চুরুলিয়ার একদিকে বীরভূমের সীমান্ত এবং অন্যদিকে সাঁওতাল পরগনার অনুচ্চ পাহাড়। বীরভূমের বাউল সুর, সাঁওতালী ঝুমুরের উন্মাদনা, বর্ধমানের লেটো-ভাদুর সুর তাঁকে প্রানচাঞ্চল্যে ভরিয়ে রেখেছে শৈশব থেকেই। মাত্র বারো বছর বয়সে লেটো গানের দলে যোগদানের মাধ্যমে কৈশোরেই নজরুল লোকসংগীতের ভুবনে প্রবেশ করেন। মূলত লেটোদল থেকেই নজরুলের শিল্পী জীবনের শুরু। লেটো দলে পালাগানের আদলে গান বাঁধা থেকেই লোক ঐতিহ্যের সাথে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে নজরুল বাংলা গানের প্রায় সব ঘরানাতেই স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সংগীত প্রতিভা ছিল মূলত রাগসংগীতানুগ, কিন্তু লোকসংগীতেও তাঁর অবদান চোখে পড়ার মত। গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগদানের পর বিভিন্ন রেকর্ড ও সবাক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নজরুলের বেশ কিছু লোকসুরের গান প্রকাশ পেতে থাকে। এসব মাধ্যমে নজরুল একের পর এক উল্লেখযোগ্য লোকসুরের গান রচনা করেন এবং সংগীতের এ ধারাকে বেগবান করে তোলেন। নজরুলের সংগীত প্রতিভা মূলত রাগসংগীতানুগ হলেও লোকসুরে রচিত তাঁর গানগুলো সমান যুগোপযোগী এবং সংগীতিক ব্যঞ্জনায় অনবদ্য। তাঁর দৃষ্টান্তে অন্যান্য সংগীত রচয়িতাগন ও সংগীতের এ ধারায় গান রচনা করার অনুপ্রেরনা

পান। নজরুল লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারা যেমন, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল, ঝুমুর, ঝাঁপান, সাঁওতালী, প্রভৃতি সুরে প্রায় ১৬০ টির মত গান রচনা করেছেন।[১২]

এছাড়াও তাঁর রচিত বহু গানে বানী এবং সুরভাগে লোকসংগীতের প্রভাব রয়েছে। এই অধ্যায়ে নজরুলের গানে লোকসুরের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নজরুলের সংগীত প্রতিভা ছোটবেলা থেকেই একটু একটু করে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। কৈশোরে লেটো দলের গায়ক, গীতিকার এবং সুরকার হিসেবে সংগীতের সাথে তাঁর যোগসূত্র তৈরি হয়। ধীরে ধীরে লেটোর দলে তাঁর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর দায়িত্বকাল শেষে নজরুল ১৯২০ সাল থেকে বৃহৎ পরিসরে সংগীত রচনায় ব্রতী হন এবং গ্রামোফোন, বেতার প্রভৃতি মাধ্যমে জড়িত হওয়ার পর থেকে তাঁর এই সংগীতকর্ম বিভিন্ন পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। জন্মস্থান চুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ঝুমুর গান, লেটোগানের সুরের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। লেটোর দলে তাঁর রচিত গানগুলো লোকসংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। পরবর্তিতে বাংলা লোকসংগীতের প্রচলিত বিভিন্ন ধারায় তিনি গান রচনা করেন। বরাবরের মত তাঁর রচনার বহুমুখীতা এই ধারায়ও বেশ লক্ষ্যনীয়। লোকসংগীতের বিভিন্ন আঙ্গিকে নজরুল গান রচনা করেছেন। এসব গান বানী ও সুরবৈচিত্র্যে অনন্য।

নজরুলের সংগীত প্রতিভা মূলত রাগসংগীতানুগ। তাঁর সুরারোপিত প্রায় সকল অঙ্গের গানে রাগরাগিণীর ব্যবহার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সব্যসাচী প্রতিভার অধিকারী এই সংগীতজ্ঞ বাংলা সংগীতের সকল পর্যায়ে তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। লোকসুরে রচিত তাঁর গানগুলো বিষয় এবং সুরবৈচিত্র্যে একদম মাটি ও মানুষের গন্ধস্পর্শী। সংখ্যায় অল্প হলেও গানগুলো যেন একটির থেকে অন্যটি অসাধারণ বৈচিত্র্যপূর্ন। যেমন কথা তেমন সুরের সামঞ্জস্য প্রতিটি গানে বিদ্যমান।

বাংলা গানে লোকসুরের প্রভাব ও ব্যবহার বহু আগে থেকেই প্রচলিত। বাংলা গানের আধুনিক যুগের সূচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অতুলপ্রসাদ সেন বাউল এবং ভাটিয়ালি সুর অবলম্বনে গান রচনা করেছেন। কিন্তু নজরুলের গানে লোকসুরের বহুমুখি প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বাংলার চিরায়ত সুর ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল ছাড়াও ঝুমুর, ঝাঁপান ইত্যাদি সুরের ব্যবহার করেছেন। বাংলা কাব্যসংগীতের রচয়িতাদের মধ্যে নজরুল প্রথম ঝুমুর সুরের সার্থক প্রয়োগ করেন। এ পর্যায়ে নজরুল রচিত লোকসুরের গানগুলোর বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

ভাটিয়ালি

বাংলা লোকসংগীতের প্রধান একটি ধারা হল ভাটিয়ালি। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী নির্ভর জীবনের আলেখ্য রয়েছে এ গানে। নদীতে ভাটির গ্রোতে নৌকা প্রবাহিত হবার সময় গাওয়া হয় বলেই একে ভাটির গান বা ভাটিয়ালি বলা হয়। ভাটির টানে পালে হাওয়া লাগার ফলে নৌকা ভেসে চলার সময় মাঝিরা তাদের অলস মুহুর্তে এই গান গেয়ে সময় কাটিয়ে দেয়। নদী হাওর প্রধান পূর্ব ময়মনসিংহ ও সিলেটের নিম্নাঞ্চলে এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত। সাধারন জনজীবনের আকুতি এই গানের লম্বা টান এবং নিরাসক্ত সুরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। নজরুল ভাটিয়ালি সুরে বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। বাংলার চিরাচরিত ভাটিয়ালি গানের বিষয়বস্তু এসব গানেও বিদ্যমান। ভাটির টানে নৌকা চলার সময় মাঝিদের শ্রম লাঘব হয়। তখন গলা ছেড়ে মাঝিরা অলস সুরে ভাটিয়ালির সুরে টান দেয়। মাঝিদের জীবন কাহিনী নদীর তীরের দৃশ্যাবলী, তাদের প্রেম বিরহ গাঁথা, সুখ-দুঃখ সবই এই গানের বিষয়বস্তু। শুধু মাঝিদের নয়, মাঠের কাজের অবসরে বিশ্রামরত কৃষক, রাখালের জীবনগাঁথা এই গানে প্রকাশ পায়। নজরুলের ভাটিয়ালি সুরের গানগুলোর কথার মধ্যে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহজেই ধারনা পাওয়া যায়। একটি গানের উল্লেখ করা হল এ পর্যায়েঃ

পদ্মার ঢেউরে- মোর শূন্য হৃদয়- পদ্ম নিয়ে যা, যা রে
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা, আমি হারায়েছি তারে ॥
মোর পরান-বঁধু নাই, পদ্মে তাই মধু নাই (নাই রে)
বাতাস কাঁদে বাইরে, সে-সুগন্ধ নাই রে
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি ঝঙ্কারে রে ॥
ও পদ্মারে- ঢেউয়ে তোর ঢেউ উঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিলমি্ল করে কৃষ্ণ-কালো
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায়
যদি দেখিস তারে, দিস এই পদ্ম তার পায়
বলিস, কেন বুকে আশার দেয়ালি জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির অন্ধকারে ॥[১৩]

অত্যন্ত সুপরিচিত এ গানটিতে বিরহবিধুর প্রেমিকের নিঃসঙ্গতা, হারানোর বেদনা তুলে ধরা হয়েছে। ভাটিয়ালি গানে নদী প্রধান একটি উপাদান। পদ্মার ঢেউকে উদ্দেশ্য করে বিরহকাতর প্রেমিকের এ গান। কখনো প্রেয়সীকে না পাওয়ার বেদনায় প্রেমিকের বিরহ ভাব আবার পদ্মা নদীর সৌন্দর্যের সাথে

প্রেমিকার রূপের বর্ননা ফুটে উঠেছে। একাকিত্ব, নিরাসক্ততা, বিরহ, প্রেম সব মিলিয়ে ভাটিয়ালির পুর্ন রূপ ফুটে উঠেছে গানটিতে।

গানটিতে ভাটিয়ালির সুরবৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। গানের মাঝে মাঝে দীর্ঘ টান ভাটিয়ালির প্রধান একটি সুরবৈশিষ্ট্য। এ গানটিও সুর টেনে টেনে গাওয়া হয়েছে। একটি পর্যায়ে 'সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায়' লাইনটিতে চড়ার স্বরে দীর্ঘ টান রয়েছে-

র্সা I রা র্গরা -র্সা I
বাঁ শি বা০ ০

র্সরা -র্গা -া I -া -া -া I রর্মা -র্গা -রর্সা I
জা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০

গানটি এই অংশের জন্যই শ্রোতামহলে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। কলকাতা বেতারে প্রচারিত গীতিচিত্র 'পদ্মার ঢেউ' অনুষ্ঠানে বিখ্যাত শিল্পী শচীন দেব বর্মনের গাওয়া গানটি নজরুলের ভাটিয়ালি অঙ্গের গানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'আমার এ না যাত্রী না লয় ভাঙা আমার তরী' গানটিতে 'ভাঙা আমার তরী' অংশটুকুর স্বরবিন্যাস বিশ্লেষণ করলে ভাটিয়ালির ঢঙটি প্রকাশ পায়।

পা মা I -া গা রা গা I [স]রা সা সা -া
ভা ঙা ০ আ মা র ত ০ রী ০

-আবার স্থায়ীর পুনরাবৃত্তিতে 'ও ভাই আমার' কথায়-

সা সা I [স]ধা সা [স]ধা সা I সা -া -া রা
ও ভাই আ ০ মা ০ র এ না ০

-উপরোক্ত স্বরবিন্যাসে ভাটিয়ালির পূর্ণরূপ ফুটে ওঠে।

অন্য একটি গান 'এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে এইতো নদীর খেলা' জনপ্রিয় নাটক 'সিরাজউদ্দৌলা' তে ব্যবহৃত হয়েছে। ভীষণ জনপ্রিয় এ গানটিতেও ভাটিয়ালির বিষয় ও সুরবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গ্রামোফোন এবং নাটকের মাধ্যমে কাজী নজরুলের ভাটিয়ালি সুরের গান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও প্রতিটি গান স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এ পর্যায়ের কিছু গান নিম্নবর্ণিতঃ

১। পদ্মার ঢেউরে, মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যারে

এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা, আমি হারায়েছি তারে

২। এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে এইতো নদীর খেলা

সকাল বেলা আমির রে ভাই, ফকির সন্ধ্যাবেলা

৩। আমার ভাঙ্গা নায়ের বৈঠা ঠেলে

আমি খুঁজে বেড়াই তারেই রে ভাই যে গিয়েছে আমায় ফেলে

৪। আমার এ না' যাত্রী না লয় ভাঙ্গা আমার তরী

আমি আপনারে লয়ে রে ভাই এপার ওপার করি

৫। আমি ময়নামতির শাড়ী দেবো চলো আমার বাড়ী

ওগো ভিন গেরামের নারী

৬। তোর রূপে সই গাহন করে জুড়িয়ে গেলো গা

তোর গাঁয়েরই নদীর ঘাটে বাঁধলাম এ মোর না।

৭। উজান যাওয়ার গান গো এবার গাসনে ভাটিয়ালি

আর গাসনে ভাটিয়ালি

৮। ওরে মাঝি ভাই,

ও তুই কি দুখ পেয়ে কূল হারালি অকূল দরিয়ায়

৯। কোন বিদেশের নাইয়া তুমি আইলা আমার গাঁও

কুলবধূর সিনান ঘাটে বাঁধলে তোমার নাও

১০। ও কূল ভাঙ্গা নদীরে

আমার চোখের জল এনেছি মিশাতে তোর তীরে

ভাটিয়ালি গানের প্রধান একটি বিষয়বস্তু হচ্ছে নদী। কবির রচিত প্রায় প্রতিটি ভাটিয়ালি গানের বানী নদীকেন্দ্রিক এবং সুরেও প্রচলিত ভাটিয়ালির নিরাসক্ততা, উদাস এবং করুন ভাব অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

ভাওয়াইয়া

বাংলা লোকগানের আরেকটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে ভাওয়াইয়া। ভাটিয়ালি, বাউল, ঝুমুর প্রভৃতি লোকসংগীতের মত একটি বিশিষ্ট সংগীত ধারার নাম ভাওয়াইয়া। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে প্রচলিত ও জনপ্রিয় গান ভাওয়াইয়া। ভাটিয়ালির মত ভাওয়াইয়া সুরেও একটি নিরাসক্ত উদাসভাব সুস্পষ্ট । এই সুরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গানের পংক্তি বিশেষের সুরে দীর্ঘটান দেওয়া হয় এবং টানের শেষ দিকে গলার স্বরে ইচ্ছাকৃত ভাবে ধারাজনিত এক ধরনের ভাঙ্গনের সৃষ্টি করা হয়।

ভাটিয়ালি বা ঝুমুরের মত এই গানেরও একটি নিজস্ব গীতরীতি আছে। ভাব থেকে ভাওয়াইয়া কথার উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। তাই এই গান ভাবপ্রধান। নরনারীর প্রেম এই গানের মূল বিষয়বস্তু হলেও মূলত প্রেমিকার বিচ্ছেদ, বিরহ ভাব এই গানের সুর ও কথায় চমৎকার ভাবে ফুটে উঠে। প্রেম এবং প্রকৃতির সম্মিলন ঘটে এ গানে।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানের এই প্রবাহমান সুরকে সচেতনভাবে তাঁর গানে করে ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজেই এ গান সম্পর্কে বলেছিলেন যে- 'জানিনে এ গানের সুরে কি মায়া, আমার মন চলে যায় কোন পাহাড়িয়া দেশে সবুজ মাঠের আঁকাবাকা আলোর প্রান্তিকে উপপ্রান্তিকে।'[১৪]

ভাওয়াইয়া সুর ব্যবহার করে বেশ কিছু গান রচনা করেন তিনি। নজরুলের ভাওয়াইয়া সুরের গানগুলো বাংলা লোকসংগীতের ভান্ডারে অপুর্ব কিছু সংযোজন। এ পর্যায়ে ভাওয়াইয়া সুরের একটি গান সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

নদীর নাম সই অঞ্জনা নাচে তীরে খঞ্জনা,
পাখি সে নয় নাচে কালো আঁখি।
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে জল আনিতে সখি লো,
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকি ॥
সেদিন তুলতে গেলাম দুপুর বেলা, কলমি শাক ঢোলা ঢোলা সই
হ'লনা আর সখি লো শাক তোলা,
আমার মনে পড়িল সখি, ঢল ঢল তা'র চটুল আঁখি
ব্যথায় ভ'রে উঠল বুকের তলা।[১৫]

ভাওয়াইয়া সুরে রচিত নজরুলের এ গানটিতে প্রকৃতি ও মানবপ্রেমের বর্ননা করা হয়েছে। প্রকৃতির নানা উপাদানের সাথে রূপক অর্থে প্রেয়সীর তুলনা করা হয়েছে। ভাওয়াইয়া গান মূলত করুন রসপ্রধান গান। এ গানটির বাণীতেও প্রেমিকের বিরহ ভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বিখ্যাত শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের

গাওয়া এই গানটিতে ভাওয়াইয়া সুরেরও পরিপুর্ন আভাস পাওয়া যায়। গানের শুরুতেই কথার মাঝে মাঝে স্বরের ভাঙ্গন লক্ষনীয় যা কিনা ভাওয়াইয়া গানের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য। উদাহরন স্বরুপঃ

নদীর নাম সই অঞ্জনা

নাচে তীরে খঞ্জনা

পাখি সে নয় নাচে কালো আঁখি- এখানে 'খঞ্জনা', 'কালো আঁখি' শব্দগুলোতে স্বরের ভাঙ্গনে ভাওয়াইয়ার ভাব চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন: 'নাচে তীরে খঞ্জনা' শব্দগুলোতে নিম্নরূপ স্বরবিন্যাস ভাওয়াইয়া গানে স্বরের ভাঙ্গনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ-

ধণ ধণ ধ প I প পণ ধণ I ধ পা

খ০ ০০ ০ ন জ ০০ না০ ০ ০

আবার 'নাচে কালো আঁখি'- এখানে কালো শব্দের একই ধরনের স্বরবিন্যাস এবং এক স্বর থেকে আরেক স্বরে যাবার সময় গলায় এক ধরনের ভাঙ্গন তৈরি করা হয়েছে যা ভাওয়াইয়া গানের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য। এরকম পুরো গানেই ভাওয়াইয়া ভাব এবং বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

মপ প -া ম I প পণ ধণ I পধ পম ম প I ম -া

না০ ০ চে ০ কা লো০ ০০ ০০ ০০ আঁ ০ খি ০

এই গানটি সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে শিল্পী নিজেই বলে গেছেন তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' তে শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদ লিখেছেন-

> মেগাফোন কোম্পানিতে আমি একদিন একটা ভাওয়াইয়া গানের কলি আওড়াচ্ছিলাম। কাজিদা কতক্ষন ধরে যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন টের পাইনি। গান শেষ হয়ে গেলেই ঘরে ঢুকে বললেন, "গাও তো আব্বাস আবার গাও"। আমি গানটা একবার গাইলাম। বললেন, 'না, তুমি গেয়েই চল যতক্ষন আমি থামতে না বলি'। চোখ বুজে গানটা বোধ হয় দশ পনের মিনিট গেয়েছি, এবার তিনি বললেন, "আচ্ছা এবার এই গানটা গাও দেখি, ঠিক ঐ সুরে।" ওরই মধ্যে অবিকল সেই সুরে তাঁর গান লেখা হয়েছে। আমার গানের কলি ছিল-
>
> "নদীর নাম সই কচুয়া, মাছ মারে মাছুয়া
> মুই নারী দিচোং ছেকাপোড়া"।

কাজিদা লিখলেন-

"নদীর নাম সই অঞ্জনা

নাচে তীরে খঞ্জনা

পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি

আমি যাব না আর অঞ্জনাতে

জল নিতে সখি লো, ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকী"[১৬]

নজরুলের আরেকটি ভাওয়াইয়া গান হচ্ছে-

পদ্মদিঘীর ধারে ধারে ঐ, সখি লো কমল-দীঘির পারে।

আমি জল নিতে যাই সকাল সাঁঝে সই,

সখি, ছল ক'রে সে মাছ ধরে, আর, চায় সে বারে বারে ॥

মাছ ধরে সে, বঁড়শী আমার বুকে এসে বেঁধে, ওলো সই বুকে এসে বেঁধে,

আর, চোখের জল কলসি আমার সই,

আমি ভরাই কেঁদে কেঁদে সই যত দেখি তারে।

ছিপ নিয়ে যায় মাছ জলে তার (ওলো সই) তাকায় না তা'র পানে,

মন ধরে না মীন ধরে সে সখি লো সে জানে।

মন-ভিখারি মীন-শিকারি মুখের পানে চায়,

সখি লো চোখের পানে চায়,

আমি বঁড়শী-বেঁধা মাছের মত (গো)

সখি ছুটিয়া মরি হায়, অকূল পাথারে ॥[১৭]

এ গানটিও আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া। দ্রুত দাদরা তালে নিবদ্ধ এ গানে ছন্দে ছন্দে প্রেমিকার হৃদয়ের আকুতি ফুটে উঠেছে সুনিপুণভাবে।

নজরুল বাংলার আবহমান লোকসুরকে যেমন তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন, তেমনি ঐতিহ্যগত বাংলার প্রকৃতি, সমাজব্যবস্থা, ধর্মাচরন, প্রকৃতি এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সবকিছুকেই তুলে ধরেছেন।

ঝুমুর

বাংলা লোকসংগীতের প্রাচীন ধারা ঝুমুর। বাংলার রাঁঢ় অঞ্চলের অন্যতম লোক সংগীত ঝুমুর। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যা রাজ্যের বিস্তীর্ন এলাকা এবং বাংলাদেশের ফরিদপুর, রংপুর, রাজশাহী প্রভৃতি এলাকায় এ গান প্রচলিত। তবে বিশেষ করে সাঁওতালদের মাধ্যমেই ঝুমুর গান বাংলা

সংগীতধারার অন্তর্ভুক্ত হয়। বিভিন্ন পালা পার্বন ও উৎসবে সাঁওতালরা দল বেঁধে নৃত্যগীতানুষ্ঠানে এ গান পরিবেশন করে। তালে তালে দলবদ্ধ হয়ে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে এ গান গাওয়া হয়। সাঁওতালী পুরুষরা এ গানের সাথে মাদল বাজিয়ে সঙ্গত করে। কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান চুরুলিয়ায় ঝুমুর গানের প্রচলন ছিল। স্বাভাবিকভাবেই শাল পিয়াল মহুয়া বনের অধিবাসীদের ঐতিহ্য ঝুমুর গান কবি হৃদয়কে দোলা দিয়েছিল। বাংলা কাব্য সংগীতের উল্লেখযোগ্য রচিয়তাদের মধ্যে একমাত্র নজরুল কর্তৃকই ঝুমুরের সুর বাংলা গানে সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

নজরুল রচিত ঝুমুর অঙ্গের গানগুলো কয়লাখানি অঞ্চলের সামাজিক অবস্থা, জীবনযাপন, প্রেম বিরহ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আভাস দেয়। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাও এ গানের উপজীব্য হয়। কাজী নজরুলের ঝুমুর গানে মূলত নরনারীর প্রেম আলেখ্য প্রধান বিষয়বস্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে একটি গানের উদাহরণ দেয়া যায়ঃ

ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে গায়ে লো
নাচব দুজন মাদল, বাঁশি, নুপুর নিয়ে আয় লো ॥

আর জনমে চোরকাঁটা তুই ছিলি রে
এই জনমে আঁচল ছিঁড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি
চোরকাঁটা নয় ছিলাম পানের খিলি লো
গয়না ছিলাম গায় লো ॥[১৮]

এই গানটিতে ঝুমুর গানের ভঙ্গিতে নরনারী প্রণয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

-আবার 'ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ' কথাটির স্বরবিন্যাসেই ঝুমুরের সুরবৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে:

সা জ্ঞা -া I মা পদা পা I মা জ্ঞা -া I সা -া -া
ঝু মু র না চে০ ০ ডু মু র গা ০ ছ

আবার 'নাচব দুজন মাদল, বাঁশি, নুপুর নিয়ে আয়' কথাটিতে-

মা পা ধণা I ধা পামা -া I মা -া -া I সা -া -া
না চ ব০ ০ দু০ ০ জ ০ ০ ০ ০ন্

পা দা -া I পা দা -া I পা পা দা I পা দা -া
মা দ ল বাঁ শী ০ নূ পু র্ নি য়ে ০

মা পা দপা I পমা জ্ঞ সা I র মা -া I পনা দা পা

আ ০ ০য়্ লো০ ০ ০ নূ পু র নি০ য়ে ০

মা -া -া I -া -া -া

আয় ০ ০ ০ ০ ০

-এ ধরনের স্বরবিন্যাস ঝুমুর গানের চমৎকার আবহ তৈরি করে।

নজরুল নিজেই কয়লাখনি এলাকার মানুষ। ঝুমুরের সুর ও বিষয়বস্তু তাঁর গানে চমৎকার ভাবে উঠে এসেছে। ঝুমুর গানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দোলা দেখা যায় । এ গানের পরিবেশনকারি এবং শ্রোতা উভয়েই জমজমাট এই দোলার মধ্যে থেকে এক অনির্বচনীয় আনন্দ পায় এবং এটিই এ গানের প্রধান বিশেষত্ব।

নজরুলের ঝুমুর অঙ্গের গানগুলো অসম্ভব শ্রুতিমধুর এবং নজরুল সংগীতপ্রেমীদের কাছে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়। গানগুলো একাধারে বানীমাধুর্য্য এবং সুর বৈচিত্র্যে ভরপুর। এ পর্যায়ের গানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গানঃ

১। চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে
কেন ডাকিস রে চোখ গেল পাখি
তোর চোখে কাহারও চোখ পড়েছে নাকি রে

২। ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে
নূপুর বেঁধে পায়ে লো

৩। এসো ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে বৃন্দাবন
ধেনু দেব বেণু দেব মালা চন্দন

৪। এই রাঙ্গামাটির পথে লো মাদল বাজে বাজে বাঁশের বাঁশি
বাঁশি বাজে বুকের মাঝে লো, মন লাগেনা কাজে লো
রইতে নারি ঘরে ওলো প্রাণ হল উদাসী লো।

৫। এলো খোঁপায় পরিয়ে দে
পলাশ ফুলের কুঁড়ি লো

৬। চুড়ির তালে নুড়ির মালা রিনি ঝিনি বাজেলো
খোঁপায় দোলে বুনোফুলের কুঁড়ি
৭। ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেধে গায় লো
নাচব দুজন মাদল, বাঁশি, নূপুর নিয়ে আয় লো
৮। নিমফুলের মউ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা
মিঠে হাসির নূপুর বাজাও ঝুমুর নাচো তোমরা
৯। মহুয়া বনে লো মধু খেতে সই
বাহিরে চাঁদ এলো, ঘরে মোর চাঁদ কই
১০। কালো পাহাড় আলো করে কে/ওকে কালো শশী
নিতুই এসে লো বাজায় বাঁশি কদম তলায় বসি
১১। ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এলে গো সই লো দেখে আয়
বঁইচি বনে বিরহে বাউরি বাতাস বহে এলোমেলো গো।

ঝুমুর গানের মধ্যে একটা জমজমাট আনন্দ এবং সুরের ছোঁয়ায় একটা ধাক্কা আছে যা গানের চলমান তালের মধ্যে হঠাৎ শ্রোতার মনকে সজাগ করে তোলে।
নজরুলের ঝুমুর অঙ্গের গানের সুরে কয়েকটি বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিছু স্বরবিন্যাস, যা অনেকটা আমাদের প্রাত্যহিক অলংকার অভ্যাসের মত।

যেমনঃ সরস, রগর, গমগ, মপম, পধপ, ধনধ, নসন, সরস
এই পাল্টা টি নজরুলের ঝুমুর অঙ্গের প্রায় সব গানেই লক্ষ্যনীয়।

যেমন: চুড়ির তালে নুড়ির মালা, গানটিতে 'চুড়ির', 'নুড়ির' শব্দগুলোতে এ ধরনের স্বরবিন্যাস রয়েছে।
ঝুমুর গান প্রধানত অবরোহনধর্মী। সুর অনেকটা চড়ার দিকে গিয়ে ধীরে ধীরে নেমে খাদের স্বরে এসে স্থির হয়। যেমনঃ
'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে
চোখ গেল পাখি,
এ পঙক্তিটুকুর স্বরলিপি বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত বৈশিষ্টের আভাস পাওয়া যায়।
ধণ -া ধ I র্সা পা -া I ধণ -া ধা I র্সা পা -া I
চো ০ খ গে ল ০ চো ০ খ গে ল ০

ণা -া ধপ I -া পা -া I পা -া দা I দপা -মা -া I

কে ০ ন০ ০ ডা ০ কি ০ স রে০ ০ ০

পদা-পা-মা I জ্ঞা সা -া I সা -া সা I -া মা া I

চো০ ০ খ গে ল ০ পা ০ খী ০ রে ০

মজ্ঞা মজ্ঞা -া I রা সা -া I সা-া সা I -া -া -া I

চো০ ০০ খ গে ল ০ পা ০খী ০ ০ ০

গানটিতে 'চোখ গেল চোখ গেল' কথাটি চড়ার সুরে শুরু হয়ে অবরোহণ করতে করতে ' চোখ গেল পাখী ' কথাটি খাদের সুরে এসে স্থির হল।

আবার 'হলুদ গাঁদার ফুল' গানটিতেও একই রকম সুরবৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

সাঁওতালী

সাঁওতালী গান ঝুমুর গানের কাছাকাছি একটি ধারা। সাঁওতাল নামে বিশেষ একটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের গীতরীতি এটি। ঝুমুর গানের ছন্দের মত কিন্তু কিছুটা ধীরগতিতে এই গান গাওয়া হয়। এ গানকে সাঁওতালী ঝুমুরও বলা হয়। সাঁওতালী সংস্কৃতির ঐতিহ্যপূর্ণ বিষয় সংগীত ও নৃত্য। ঢোল, মাদল এবং বাঁশির সাথে গান তাদের লোকসংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত। নজরুলের বেড়ে ওঠা সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে। তিনি সাঁওতালী গানের সুরকে তুলে এনেছেন তাঁর গানে। সাঁওতালী সুরের অনুকরনে নজরুলের কিছু গান পাওয়া যায়। যেমন-

কালো জল ঢালিতে সই চিকন কালারে- সাঁওতালী ঝুমুর
তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি- সাঁওতালী সুর
নাচের নেশার ঘোর লেগেছে নয়ন পড়ে ঢুলে- সাঁওতালী নাচ[১৯]

সাঁওতালী গানে একটি নিরাসক্ততা এবং অলস প্রকৃতির সুরের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুরের এই ধীরগতির চলন এবং টেনে টেনে গাইবার বৈশিষ্ট্যই ঝুমুর গান থেকে সাঁওতালী গানকে আলাদা করে।

উদাহরণ স্বরূপ-

'তেপান্তরের মাঠে বধুঁ হে' গানটিতে 'মাঠে', 'থাকি' শব্দগুলোতে একটি স্বরে অনেকক্ষণ স্থিতিশীলতা

সাঁওতালী সুরের বৈশিষ্ট্য:

স -া ম I -া ম -া I ম প -া I -া -া -া I -া -া -া I -া -া -া

তে পা ন ত রে র মা ঠে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধ ন ধ I প ম -া I স ম -া I পধ প ম I ম -া -া I -া -া -া

বঁ ধু ০ হে ০ ০ এ কা ০ ব০ সে ০ থা কি ০ ০ ০ ০

আরেকটি গানের উদাহরণ-

নাচের নেশার ঘোর লেগেছে নয়ন পড়ে ঢুলে লো

বুনোফুল পড়ল ঝরে নাচের ঘোরে দোলন খোঁপা খুলে লো-

শুনে এই মাদল বাজা নাচে চাঁদ রাতের রাজা

নাচে লো নাচে

শালুকের কাঁকাল ধরে তালপুকুরে জলে হেলেদুলে লো

আউড়ে গেল ঝুমকো জবা লেগে গরম গালের ছোঁয়া

বাঁশি শুনে ঘুলায় মনে কয়লা খাদের ধোয়া লো

সই নাচ ফুরালে ফিরে ঘরে রাত কাটাবো কেমন করে গো

পড়বে মনে বাঁশরিয়ার চোখ দুটি টুলটুলে লো।[২০]

গানটিতে সাঁওতালদের বিশেষ একটি অনুষ্ঠান মহুয়া উৎসবের কথা বলা হয়েছে। শ্রাবণ মাসের ঝুলন পুর্নিমায় এই উৎসব হয়। সাঁওতালদের যেকোনো অনুষ্ঠানে নাচ ও গান প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে থাকে। এ গানে সেরকম একটি উৎসবের বর্ননা গানটির বানী ও সুরের সমন্বয়ে চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উৎসব কে ছাপিয়ে নরনারীর প্রেম এ গানের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

'নাচের নেশার ঘোর লেগেছে নয়ন পড়ে ঢুলে' গানে 'নেশার' কথাটিতে পধপ, মগম, আবার 'দোলন খোঁপা খুলে' লাইনটিতে ধণধ, পধপ, মপম, রমর-স স্বরবিন্যাস রয়েছে। পুরো গানেই এ ধরনের স্বরবিন্যাস রয়েছে যা ঝুমুর এবং সাঁওতালী গানের বিশেষ ঢংটিকে প্রকাশ করে।

বাউল

বাউল গান বাংলার চিরায়ত সংগীতধারার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি ধারা। যুগে যুগে বাংলার সুরকারগন বাউল সুরে গান বেঁধেছেন। লোকসংগীতের ধারায় বাউল সুরের একটা বিশেষ স্থান আছে।

বিশেষ এই ধর্ম বা মতাবলম্বীদের বাউল বলা হয়। আত্মভোলা ও ভাবের সাধক বাউলরা সমাজের প্রচলিত আচার রীতির প্রতি আস্থাশীল নয় আবার প্রচলিত ধর্মের অনুসারী নয় বলে তাঁদের নাস্তিকও বলা যায়না। বাউলের ভক্তি বিশ্বাস ও সাধনাতে বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ ও ইসলামের সুফীবাদের সংমিশ্রন পাওয়া যায়। বাউল গানের এ বৈরাগ্য বিচ্ছেদ অন্তহীন উদাসীনতা খুব সুচারুরূপে ফুটে উঠেছে নজরুলের বাউল অঙ্গের গানগুলোতে। এসব গানের কথা গূঢ় তত্ত্বঘেঁষা হলেও, সুরটি একদম সহজ,হালকা আমেজের হয়। বাউলরা অনেক সময় দাঁড়ানো অবস্থায় নৃত্যছন্দে দেহ দুলিয়ে গান করে। বাউল দর্শন ও মরমী ভাবধারার আদর্শে নজরুল বেশ কয়েকটি গান রচনা করেছেন। গানগুলো গায়কী, সুর ও পরিবেশন রীতিতে গতানুগতিক বাউল সুরধারারই নিদর্শন। তিনি তাঁর রচনায় বলেছেনঃ

‘মোরা ভাই বাউল চারণ মানিনা শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে’

শৈশবে লেটো দলের হয়ে গ্রামে গ্রামে চারণ বেশে ঘুরতেন যিনি, বাউল ভাবধারার সংগীত রচনা তিনি স্বতস্ফুর্ত ভাবেই করেছেন বলে ধরে নেয়া যায়। চারণের চরিত্রের সাথে একাত্ম হয়ে যেতেন তিনি। চারণ সম্রাট মুকুন্দ দাসের কাছেও নজরুল নিজেকে চারণ বলে পরিচয় দিয়েছেন। নিজের রচিত ‘অগ্নিবীণা’ ও ‘বিষের বাঁশি’ কাব্যগ্রন্থ দুটি কবি মুকুন্দ দাসকে উপহার দিতে গিয়ে বলেন, ‘যারা গান ও বক্তৃতা দ্বারা দেশের জাগরণ আনতে চেষ্টা করেন .... তাঁরা চারণ। আমি, আপনি, আমরা ..... চারণ। তবে আপনি আমাদের সম্রাট, অর্থাৎ চারণ সম্রাট।’[২১]

এছাড়াও চারণের পোশাক পরে নজরুল রাজনৈতিক মঞ্চে গান পরিবেশন করেন। গেরুয়া পোশাক পরে সুভাষ বসুর সামনে একটি উদ্দীপনামূলক গান গেয়েছিলেন তিনি। গানটি ছিলঃ
‘দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাপার হে!
লংঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার’

এসব আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় নজরুল বাউল মতাদর্শের সাথে নিজের জীবনকে একাত্ম করতে পেরেছিলেন।

এ পর্যায়ে নজরুল রচিত একটি বাউল গানের বানী বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হলঃ
আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল
আমার দেউল আমারি এই আপন দেহ
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর অন্তরে মন্দির- গেহ’ ।।

সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে আমার বুকে অহরহ,

কভু তায় প্রণাম করি, বক্ষে ধরি, কভু তা'রে বিলাই স্নেহ।।

ভুলায়নি আমারি কূল, ভুলেছে নিজেও সে কূল,

ভুলে বৃন্দাবন গোকুল মোর সাথে মিলন বিরহ।

সে আমার ভিক্ষা ঝুলি কাঁধে তুলি', চলে ধূলি - মলিন পথে,

নাচে গায় আমার সাথে একতারাতে, কেউ বোঝে, বোঝে না কেহ।।[২২]

এ গানটির সুর বিশ্লেষণ করলে বাউল সুরের আবহ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। যেমন:

সা I সা -া রা I গা পা -া I ধা র্সা না I ধা পা -া I ধা পা গা

আ মি ভা ই ক্ষ্যা পা ০ বা উ ল আ মা র দে উ ল

গা মা গা I রা গা রা I গা -া মা I গা রা গা I রা সা -া

আ মা ০ রি এ ই আ প ন দে হ ০ ০ ০ ০

- এখানে 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল', 'আপন দেহ' এই কথা গুলোর স্বরবিন্যাস বাউল সুরের অনন্য নির্দশন।

নজরুলের বাউল সুরের গানের অনন্য নিদর্শন 'কান্ডারী গো কর কর পার' গানটির স্থায়ীর কথাগুলোতে বাউলের পরমার্থ চিন্তা ফুটে উঠেছে।

কান্ডারী গো, কর কর পার

তোমার চরণ-তরী বিনা প্রভু

পারের আশা নাহি আর--

আবার গানের দ্বিতীয় অন্তরার শেষ অংশ-

ল'য়ে তোমার নামের কড়ি

সাধু পেল চরন-তরী

সে কড়ি নাই যে কাঙালের

হও হে দীনবন্ধু তার।

-এই অংশে ‘ল’য়ে তোমার নামের কড়ি’- তে সুরের দীর্ঘ টান এবং ভাবার্থেও বাউলের নিরাসক্ততা ও মরমী ভাবধারার প্রকাশ পাওয়া যায়। পুরো গানেই বাউল সুরের প্রভাব পাওয়া যায়। বিশেষ করে ‘কান্ডারী গো’ কথাটিতে--

গা -া মা I পা পণা ধণা I ধা পা পদপা

কা ন্ ডা রী গো০ ০০ ০ ০ ক০০

ম্গা গমগা র্সা I রা সা -া I -া

র ক০০ র পা ০ ০ র

-এই অংশটুকুতে বাউল গানের পূর্ণ আভাস পাওয়া যায়।

বাউল গানে দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসেবে দেহকেই সকল কিছুর মূল ধরা হয়। দেহের ক্রিয়া বন্ধ হলে মানুষের সকল কিছু সে মুহূর্ত থেকেই নিরর্থক হয়ে যায়। এ গানটিতে কবি বাউলের এ বিষয়বস্তুকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের দেহেই ঈশ্বরের প্রকাশ এই অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে গানটিতে। বাউল গান তত্ত্বমূলক। আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ এ গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ পর্যায়ে একটি গানের উদাহরনঃ

ভবের এই পাশা খেলায় খেলতে এলি হায় আনাড়ি
হাতে তোর দান পড়েনা হাত খোলেনা তাড়াতাড়ি।
তুই আর তোর সাথি ভাই, কাঁচা খেলোয়াড় দু’জনাই
মায়া, রিপুর সাথে তাই নিত্য হেরে ফিরিস বাড়ি।।
তোরি সে চালের দোষে যায় কেঁচে তোর পাকা ঘুঠি,
ফিরিতে হয় অমনি যেমনি যাস ঘরে উঠি।
ও হাতে হর্দম চক ছয়-তিন-নয় পড়ছে আড়ি।।
সংসার -ছক পেতে হায়, ব’সে র’স মোহের নেশায়,
হেরে যে সব খোয়ালি যাসনে তবু খেলা ছাড়ি।।
প্রাণ মন এই দুই ঘুঠিতে যুগ বেঁধে তুই যা এগিয়ে,
দেহ তোর একলা ঘুঠি রাখ আড়িতে মা’র বাঁচিয়ে।
আড়িতে মা’র খেলে তুই স্বর্গে যাবি জিতবি হারি’।।[২৩]

গানটিতে জাগতিক জীবনে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ষড়রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার এবং হিংসার কাছে হেরে যাবার কথা বলা হয়েছে। এই ষড়রিপু কে নিয়ন্ত্রন করতে পারলে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এ পর্যায়ে বাউল সুরের কিছু গানের উল্লেখ করা হলঃ

১। আমি বাউল হলাম ধুলির পথে লয়ে তোমার নাম
আমার একতারা তে বাজে শুধু তোমারই গান শ্যাম

২। আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল
আমার দেউল আমারি এই আপন দেহ

৩। পথ ভোলা কোন রাখাল ছেলে
সে একলা বাটে শূন্য মাঠে
খেলে বেড়ায় বাঁশি ফেলে

৪। গেরুয়া রং মেঠো পথে বাঁশরী বাজিয়ে কে যায়
সুরের নেশায় নুয়ে পড়ে ভুই-কদম তাঁর পায়ে জড়ায়

৫। আমি ডুরি ছেড়া ঘুড়ির মতন চলছি উড়ে প্রাণ সই
ছুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ঝড় বাতাসে পড়ব কোথায় শ্যাম সই

৬। সাগর আমায় ডাক দিয়েছে মন নদী তাই ছুটছে ঐ
পাহাড় ভেঙে মাঠ ভাসিয়ে বন ডুবিয়ে তাইতো রই

৭। এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা কেউ অচেনা নাই
যারে দেখি মনে হয় সেই বন্ধু প্রিয় ভাই

৮। ভবের এই পাশা খেলায় খেলতে এলি হায় আনাড়ি
হাতে তোর দান পড়েনা হাত খোলেনা হায় আনাড়ি

৯। কান্ডারী গো কর কর পার এই অকূল ভব পারাবার
তোমার চরণ তরী বিনা, প্রভু পারের আশা নাহি আর

১০। বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু
আমি সুর শুনে তা'র বাউল হয়ে এনু গো

ঝাঁপান

মূলত বেদে বেদেনীর গানকে ঝাঁপান গান বলা হয়। সাপুড়ে সম্প্রাদায় সাপখেলার উৎসবে এ গান পরিবেশন করে থাকে। এ ধরনের উৎসবে সাপুড়েরা তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের গুণ ও জ্ঞানের পরীক্ষা প্রমাণের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সাথে সাপ খেলার প্রতিযোগিতা করে থাকে। সাপের দেবী মনসার মাহাত্ম্য চাঁদ সওদাগর বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী নিয়ে রচিত এ গান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ঝাঁপান খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রায় তিন শত বছর আগে রচিত 'মনসার ভাসানে' গ্রামাঞ্চলে ঝাঁপান খেলার কথা এভাবে বর্নিত হয়েছে- 'সর্প খেলে ঝাঁপানিয়া ওঝা'।

নজরুল ঝাঁপান গান রচনা করেছিলেন মূলত বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে। চলচ্চিত্র, মঞ্চ, নাটক ও গ্রামোফোন কোম্পানীর বিভিন্ন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তিনি বেশ কিছু ঝাঁপান সুরের গান রচনা করেন। এসব গানে বেদে বেদেনীর জীবনযাত্রা, সাপ খেলার দৃশ্য বর্ননা ছাড়াও প্রেম, বিরহ, প্রেয়সীর রূপের বর্ণনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন রকমের শব্দচয়ন যেমন: কলার মান্দাস, ডেরা, বেদের কুমার, এসব নজরুলের ঝাঁপান অঞ্চলের গানগুলোকে আরো বেশি অর্থবহ ও মাটির মানুষের কাছাকাছি নিয়ে গেছে।

বেদে বেদেনীর গানকে বলা হয় ঝাঁপান। নজরুল বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঝাঁপান গান রচনা করলেও এ গান রচনার পেছনে অকৃত্রিম এক ভাল লাগাও ছিল। বানীচিত্র ও আলেখ্যর প্রয়োজনে তিনি বেশ কিছু ঝাঁপান গান রচনা করেছিলেন। ঝাঁপান গানে অনেক সময় ঝুমুরের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। সাপুড়ে চলচ্চিত্রে হলুদ গাঁদার ফুল, কথা কইব না বৌ, আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ প্রভৃতি অসংখ্য জনপ্রিয় গান রচনা করেন নজরুল।

সাপ, বেহুলা, লক্ষীন্দর, চাঁদ সওদাগর, বেদে-বেদেনীর জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত নজরুলের ঝাপান শ্রেণীর গানগুলো অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এসব গানে কবি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেদেনীপাড়া থেকে লোক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এসব গানে লৌকিক বিশ্বাস, মন্ত্র, কুসংস্কার, প্রথা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

নজরুল রচিত বিখ্যাত একটি ঝাঁপান গানের উদাহরন এ পর্যায়ে দেয়া হলঃ

খা খা খা তোর বক্ষিলারে খা
তারি দিব্যি ফ্যাতে তোর যে ঠাকুরের পা
বিষহরি শিবের আজ্ঞে দোহাই মনসা

আমায় যদি কামড়াস খাস জরৎ-কারুর হাড়
নাগ নাগিনী ফুা তুলে নাচ রে হেলেদুলে
মারলে ছোবল বিষ-দাঁত তোর অমনি নেব তুলে
বাজ তুবরি বাজ ডমরু বাজ, নাচ রে নাগ-রাজ
সাপুড়িয়া রে- বাজাও বাজাও সাপ খেলানোর বাঁশি
কালিদহে ঘোর উঠিল তরঙ্গ রে, কালনাগিনী নাচে বাহিরে আসি'।
ফনি-মনসার কাঁটা-কুঞ্জতলে গোখরা কেউটে এলো দলে দলে
সুর শুনে ছুটে এলো পাতাল-তলের বিষধর বিষধরি রাশি রাশি।
শন-শন-শন শন পুব হাওয়াতে তোমার বাঁশি বাজে বাদলা-রাতে
মেঘের ডমরু বাজাও গুরু গুরু বাঁশির সাথে।[২৪]

এই গানটির শুরুর অংশটুকু সাপুড়েদের মন্ত্র পড়ার ঢংয়ে আবৃত্তি করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সাপের উপদ্রব যখন বেশি হয় তখন সাপুড়েদের আনা হয় সাপ তাড়ানোর জন্য। বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র এবং বিশেষ বিশেষ সুরে বাঁশি বা বীণ বাজিয়ে সাপের সন্ধান করে তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। এরকম এক সাপুড়িয়ার কথা বলা হয়েছে এ গানে।

এই গানটির সুর বিশ্লেষন করার চেষ্টা করছি:

সা রা মা পা I পদা -া -া -া I পদা পমা মা -া I রজ্ঞা রসা সা -া
সা পু ড়ি য়া রে০ ০ ০ ০ বা০ ০০ জা ও বা০ ০০ জা ও

জ্ঞরা সা জ্ঞরা সা I জ্ঞরা সা জ্ঞরা সা I জ্ঞরা সা -া -া I -া -া -া -া
সা০ প খে০ লা নো০ র বাঁ০ ০ শী০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-এখানে 'সাপ খেলানোর বাঁশী' কথাটির স্বরবিন্যাসে ঝাঁপান গানের আভাস পাওয়া যায়। কাহারবা তালে গানটি নিবদ্ধ, তবে কাহারবার ৪/৪ ছন্দে প্রতি ৪ মাত্রায় একটি ঝোঁক ফেলা হয় যার মাধ্যমে সাপুড়েদের গানের ছন্দ পাওয়া যায়।

আবার 'বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয়' গানটিতে 'আয় আয় আয়' শব্দগুলোতে 'সন্ সন্ স' স্বরবিন্যাসের ভঙ্গিটিও ঝাঁপান গানের সাথে সম্পর্কিত।

নজরুল ঝাঁপান গানে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির উৎকৃষ্ট উদাহরন তুলে ধরেছেন। ঝাঁপান সুরে নজরুল রচিত আরো কিছু গানের উল্লেখ করা হল এ পর্যায়ে:

অঙ্গ জর জর বিষে বাঁচাও বিষহরি এসে রে

এ কি বাঁশি বাজালো কালা, সর্বনাশী।

১। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ
ওই পাহাড়ের ঝর্না আমি ঘরে নাহি রই গো
উধাও হয়ে রই

২। আয়লো বনের বেদেনী আয় আয় আয়
কিংশুকে তটিনীতে জাগায়ে তরঙ্গ কাঁপাইয়া মেদিনী

৩। কথা কইবোনা কথা কইবোনা বৌ

৪। কলার মান্দাস বানিয়ে দাওগো শ্বশুর সওদাগর

৫। ছন্নছাড়া বেদের দল আয়রে আয়

৬। চিকন কালো বেদের কুমার কোন পাহাড়ে যাও

৭। পিছন পথে কুড়িয়ে পেলাম হিজল ফুলের মালা

৮। সাপুরিয়া রে বাজাও তোমার সাপ খেলানো বাঁশী

৯। বাকা ছুড়ির মত বেঁকে উঠল যে তোর আঁখিরে

নজরুল ঝাঁপান শ্রেনির গানগুলো রচনা করেছিলেন বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে। তবে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করতেন সেটি সম্পর্কে পূর্নাঙ্গ জ্ঞান রাখতেন। এ গান সৃষ্টি করার আগে নজরুল নিজে গিয়ে পাড়াগাঁয়ের বেদে বেদেনীদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি এবং তাদের সুর শিখে এসেছিলেন। এ কারনে ঝাঁপান গানগুলোতে চিরাচরিত বেদে সম্প্রাদায়ের জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়। পাতালপুরী ও সাপুড়ে চলচ্চিত্রে নজরুল ঝুমুর এবং ঝাঁপান গানের ব্যবহার করেছেন এবং বলাবাহুল্য যে, বাংলা গানে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে এসব সুরের প্রয়োগ করেন। এসব চলচ্চিত্রের গান সৃষ্টির জন্য তিনি অজপাড়াগাঁয়ে বেদে-বেদেনীদের আস্তানায় গিয়ে তাদের জীবনযাত্রা, গানের সুর আত্মস্থ করেন এবং সেসব সুরে কালজয়ী গান সৃষ্টি করেন যা আজও নজরুল প্রেমীদের কাছে অনন্য হয়ে আছে।

কাজরী

কাজরী মূলত একপ্রকার লোক সংগীত। বর্ষা ঋতুভিত্তিক শৃঙ্গার রস প্রধান একধরনের লোকসংগীত হল কাজরী। ভারতের কাশী ও মির্জাপুর অঞ্চলে এ গানের প্রচলন বেশী। শৃঙ্গার রসপ্রধান এই গানে নায়ক নায়িকার উক্তিতে আদিরসের উল্লেখ বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। বর্ষা ঋতু প্রধান বলে বর্ষাতেই এই গান

বেশী গাওয়া হয়। নজরুল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ ধরনের সুরও নিজের গানে প্রযুক্ত করেছেন। তার শাওন আসিল ফিরে গানটি শুনলেই কাজরী গানের মর্মস্পর্শী আবহ পাওয়া যায়। নজরুল রচিত বেশ কিছু কাজরী গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গানঃ

১। শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এলোনা

২। কাজরী গাহিয়া এস গোপ ললনা

৩। গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে, কিশোর কৃষ্ণ দোলে বৃন্দাবনে।

ছাদ পেটানো গান

বাড়ির ছাদ পেটানোর সময় শ্রমিকরা তালে তালে যে গান গেয়ে থাকে তাকে ছাদ পেটানো গান বলে। কর্মক্লান্ত শ্রমিকরা কাজের মধ্যে একটু আনন্দ আনবার জন্য হাতুড়ির তালে তালে দলবদ্ধভাবে এসব গান গেয়ে থাকেন। দিনমজুরদের দৈনন্দিন জীবন, তাঁদের দুঃখ, কষ্ট, আশা, আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যায় এসব গানের কথায়। এ ধরনের গান মুখে মুখেই বেশী প্রচলিত। সাধারণত খুব বেশী গীতিকবির রচনায় এসব গানের উল্লেখ পাওয়া যায় না। নজরুল সারাজীবন অত্যাচারিত, অবহেলিত, খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলেছেন তাঁর রচনায়। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে তিনি ছিলেন সদা জাগ্রত। লোক আঙ্গিকের ছাদ পেটানোর গান তিনি বানীচিত্রের প্রয়োজনে রচনা করেছিলেন। দরিদ্র ও কর্মজীবি মানুষের দুর্দশা, অভিযোগ ও অসহায়ত্ব এ ধরনের গানে উঠে এসেছে।

চৌরঙ্গী বানীচিত্রের জন্য রচিত এরকম একটি গানঃ

সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো

পাত ভরে ভাত পাইনা, ধরে আসে হাত গো।

১মঃ তোর ঘরে আজ কি রান্না হয়েছে?

২য়ঃ ছেলে দুটো ভাত পায়নি পথ চেয়ে রয়েছে

৩য়ঃ আমিও ভাত রাঁধিনি, দেখ না চুল বাঁধিনি

৪র্থঃ আমার ননদ বড় দজ্জাল বজ্জাত গো

সমবেতঃ সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো

পাত ভরে ভাত পাইনা ধ'রে আসে হাত গো।

১মঃ এত খায় তবু ওদের বউগুলো সুটকো

২য়ঃ ছেলেগুলো প্যাঁকাটি বাবুগুলো মুটকো

৩য়ঃ এরা কাগজের ফুল, এরা চোখে চাঁদ দেখেনা
৪র্থঃ ইটের ভিতরে কীটের মত কাটায় এরা রাত গো।।[২৫]

সমবেত কণ্ঠে কয়েকজন মহিলা শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম এবং ছাদ পেটানোর তালে তালে হৃদয়ের করুন আকুতি দারুনভাবে প্রকাশ পেয়েছে এ গানে। শ্রমিক, দিনমজুরেরা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাঝে একটু গানের মধ্য দিয়ে এভাবেই হৃদয় নিংড়ানো কষ্ট প্রকাশ করে। মানবতার কবি নজরুল এসব শ্রমিকদের কথা সবসময় বলে গেছেন তাঁর সংগীত ও সাহিত্যে।

লেটোগান

গ্রামাঞ্চলে একসময়কার বহুল জনপ্রিয় গান ছিল লেটোগান। এ গানের ধারা কিছুটা যাত্রা ও কবি গানের সংমিশ্রনে রচিত। বীরভূম,বর্ধমানের পাড়াগাঁয়ের কবিগানের অন্য এক রূপ হচ্ছে লেটোগান। গানে গানে সওয়াল জবাব, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে পান্ডিত্যপূর্ন তর্কযুদ্ধ হেয়ালী, ধাঁধা, হাস্যরসের সংমিশ্রনে এ গান গ্রামের দর্শক শ্রোতাদের বিশেষভাবে আকর্ষন করে থাকে। একেবারেই গ্রামের তথাকথিত ভাষায় এ গান সৃষ্টি। তীক্ষ্ণ প্রশ্নবানকে তৎক্ষনাৎ বুমেরাং করে দেয়াই লেটো করিয়ালদের আশ্চর্য ক্ষমতা। দুই দলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জয়পরাজয়ের ভিত্তিতে লেটোগান অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি দলে একজন প্রধান কবি থাকেন, তাকে বলা হয় 'গোদাকবি'। তিনি তার দল পরিচালনা করেন। বাকি অংশগ্রহণকারীরা প্রয়োজন মতো একক ও যৌথ গান গায়, এদেরকে বলা হয় 'সখী', 'বাই', 'ছোকরা' ইত্যাদি। গান ও অভিনয়ের মাঝে মাঝে দর্শক শ্রোতার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে একজন কৌতুক অভিনেতা থাকে, একে 'সঙদার' বলা হয়। আবার 'বিবেক' নামে একটি চরিত্র থাকে যে পালার সংকটময় মুহুর্তে এসে বিবেকের গান গায়। অভিনয় এবং নাচ লেটো গানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

শৈশবেই লেটোগানের সাথে কবি নজরুলের পরিচয় ঘটে। লেটোর দলে গান রচনা ও গাওয়া দুটোতেই নজরুল সমানভাবে পারদর্শীতা অর্জন করেন। প্রায় চার পাঁচ বছর লেটোর দলে থাকাকালীন সময়ে তিনি অনেক পালা রচনা করেন। এর মধ্যে চাষার সং, শকুনীবধ, রাজা যুধিষ্ঠীরের সং, দাতা কর্ন, আকবর বাদশা, বিদ্যাভুতুম, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ ইত্যাদি ভীষনভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজী নজরুল ছোটবেলায় লেটোর দলে যোগদান করে গান ধাঁধা থেকে শুরু করে লেটোর দলপতি হয়ে দল পরিচালনা পর্যন্ত করেছেন। লেটো গানে বন্দনা, চাপান, ঠেস, সঙের গান ,ছড়ার গান প্রভৃতি পর্যায় থাকে। এসব ধরনের গান নজরুল অনায়াসে করতেন। বিভিন্ন গ্রাম থেকে তাঁর ডাক আসত গাওয়ার জন্য, গান রচনার জন্য। কবির লড়াই আসরে তিনি নিজেই কবিয়াল হিসেবে মঞ্চে উঠতেন এবং দক্ষতার

সাথে প্রতিপক্ষকে নিজ প্রতিভার মাধ্যমে পরাজিত করতেন। কখনো দেশাত্মবোধক, ভক্তিমূলক, আবার কখনো হিন্দী, বাংলা, উর্দু, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার শব্দের সংমিশ্রনে গান রচনা করতেন তিনি। লেটোদলে গান রচনার জন্য তাঁকে কোরান, পুরান, হাদিস, রামায়ন, গীতা, মহাভারত সহ বহু বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয়েছে। তাঁর রচিত অসংখ্য লেটোগানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পালার অংশ এ পর্যায়ে উল্লেখ করা হলঃ

১। 'চাষার সঙ' পালার একটি গানের অংশঃ

চাষ কর দেহ জমিতে
হবে যে নানা ফসল এতে
নামাযে জমি উগালে
রোজাতে জমি সামালে
কলেমায় জমিতে মই দিলে চিন্তা কি হে এই ভবেতে[২৬]
- গানটি রামপ্রসাদী সুরের বিখ্যাত ভক্তিমুলক গান 'মন রে কৃষি কাজ জাননা' এই গানের ভাবার্থের মত।

২। মিশ্র ভাষারীতি অনুসরনে ইংরেজি, বাংলা, উর্দু ভাষার সংমিশ্রনে একটি ব্যঙ্গগিতিঃ

ওহে ছড়াদার, that পাল্লাদার মস্ত বড় mad
চেহারাটা monkey Like দেখতে very cad
Monkey লড়বে বাবর-কা সাথ
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত,
জানেনা ও, ছোট্ট হলেও
হামভি lion cad.[২৭]

এ গানটিতে বিভিন্ন ভাষার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যঙ্গগীতি পালার আসরে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে গাওয়া হত।

৩। যে কোন পালার শুরুতে আসর বন্দনা গাইতে হয়। এরকম একটি বন্দনা গানের অংশঃ

সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারীতা'লা
তারপরে দরদে পড়ি মোহাম্মদ সল্লে আলা।

৪। কবির লড়াই (ঠেস গান)

কেমন ওস্তাদ হে তুমি দেখবো আজ সভাস্থলে
ভীত হবে তোর ঐ দম্ফে যে হবে কচি ছেলে।

৫। প্রেমের গান
বুঝিলাম নাথ এতদিনে যুবকের ছলনা হে
কোথা শিখিলে এ প্রনয় আমারে বলনা হে।

৬। 'চাষার সঙ' পালায় একটি আবাদের গানঃ
জীবন যাপন করিতে চাষ কর বিধি মতে
রবে যদি সুখেত এই পৃথিবীর মাঝারে
জমি উগালে সামালে বীজ ফেলাও কুতুহলে
পাবে তবে সেই ফসলে মেহনতের সার।

লেটোদলে একদিনে বহু গান বা পালা রচনা করতে গিয়ে ফরমায়েসী বা তাৎক্ষণিকভাবে রচনার এক অতিমানবীয় দক্ষতা নজরুল আয়ত্ত করেন। এছাড়াও লেটোদলে গান রচনার মাধ্যমে নজরুল লোকসংস্কৃতি এবং হিন্দু মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর ধারনা লাভ করেন, যার প্রতিফলন তাঁর পরবর্তী জীবনের সমস্ত রচনায় প্রভাব ফেলে। এ অভিজ্ঞতা তাঁকে একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি হিসেবে গড়ে উঠতে নিশ্চয়ই সহায়তা করে থাকবে। নিমশা গ্রামের বিখ্যাত গোদাকবি শেখ চকোর নজরুলের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'ব্যাঙ্গাচি' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে এই ব্যাঙ্গাচি একদিন বড় হয়ে সাপ হবে। একথা বলাই বাহুল্য যে সেই গোদাকবির ভবিষ্যদ্বাণী বীফোলে যায়নি।

লোকসুর প্রভাবিত অন্যান্য গান

নজরুল শৈশব থেকেই লোকজ আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন। তাঁর সংগীত ও সাহিত্যে লোক উপাদানের উপস্থিতি সুস্পষ্ট। গ্রাম্য গীত, যাত্রাপালা, হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে তিনি লোকউপাদানের সাথে পরিচিত হয়েছেন। নজরুল রচিত সকল আঙ্গিকের কোন না কোন ভাবে লোকঐতিহ্য উঠে এসেছে। লোকসংগীতের বিভিন্ন রীতি, ঢং, আঞ্চলিকতা, তাল ও ছন্দ ব্যবহার করে তিনি বাংলা গানকে ঋদ্ধ করেছেন যা বাংলা সংগীতধারায় বিরল। বাংলার লৌকিক ও আবহমান সুরই লোকসুর। বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, শ্যামাসংগীত প্রভৃতি বাংলার লোকসুরেরই বিভিন্ন আঙ্গিক। এ পর্যায়ে নজরুলের অন্যান্য ধারার গানে লোকসুরের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হল।

নজরুলের দেশাত্মবোধক ও উদ্দীপনামূলক গানে লোকসুরের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গ প্রেক্ষাপটে লোকসুরে স্বদেশী গান রচনা করেন তিনি। দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশী চেতনার স্ফূরন ঘটিয়েছেন। এসব গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গানের উদাহরণ এ পর্যায়ে দেয়া হলঃ

নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম
চির মনোরম চির মধুর
বুকে নিরবধি বহে শত নদী চরণে জলধির বাজে নূপুর ॥
গ্রীষ্মে নাচে বামা কালবোশেখী ঝড়ে
সহসা বরষাতে কাঁদিয়া ভেঙ্গে পড়ে
শরতে হেসে চলে শেফালিকা তলে
গাহিয়া আগমনী গীতি বিধুর ॥[২৮]

বিখ্যাত শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া এ গানটিতে বাংলার ষড়ঋতুর রূপ ফুটে উঠেছে। সবুজ শ্যামল বাংলায় ছয় ঋতুতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং দেশবন্দনার অপূর্ব কথন রয়েছে এ গানে। গানটি কাহারবা তাল এবং কীর্তন সুরে নিবদ্ধ। কীর্তন গ্রামবাংলার লোকজ সুরের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরন। আরেকটি দেশাত্মবোধক গানঃ

বল ভাই মাভৈ মাভৈ, নবযুগ এলো ঐ রক্ত যুগান্তর রে
বল জয় সত্যের জয় আসে ভৈরব বরাভয়
শোন অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে

চমৎকার শব্দপ্রয়োগের সাথে বাউল সুরের সংমিশ্রনে গানটি রচিত হয়েছে।

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবণি ॥
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাটাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি ॥[২৯]

এ গানে কীর্তন এবং ভাটিয়ালি সুরের ব্যবহার লক্ষণীয়। পুরো গানটি কীর্তন সুরে নিবদ্ধ। শেষ অন্তরায় 'ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে গো' লাইনটিতে ভাটিয়ালি সুরের ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। এরকম বহু গানের মধ্যে নজরুল লোকসুর অথবা লোকউপাদান ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ:

সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়- ভাটিয়ালি সুর
শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের- কীর্তন সুর
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি- বাউল ও কীর্তন সুর।

নজরুলের ইসলামিক গানে লোকসুরের ব্যবহার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। কিছু গান রয়েছে যেগুলো বিষয়ের দিক থেকে ইসলামিক ভাবাশ্রয়ী কিন্তু লোকসুরে নিবদ্ধ। একটি গানের উদাহরন নিম্নরুপঃ

সদা মন চাহে মদিনা যাবো
আমার রসুল আরবি, না হেরে নয়নে, কি সুখে গৃহে রব।
পরান আমার লোটাতে চাহে, সেই মহী আরব ভূমে
পরান আমার লোটাতে চাহে পাক রওজার মাটি চুমে
ছাড়ি গৃহবাস যাব কমলিওয়ালা পাশ
কম্বল সম্বল করি আমি ধূলি হব, আমি সেই পথের ধূলি হব
নবী যে পথ দিয়ে চলে ছিলেন সেই পথের ধূলি হব।[৩০]

এই গানটি সম্পুর্ন ইসলামিক ভাবাশ্রয়ী, আবার সুরের দিক থেকে কীর্তনের অপূর্ব উদাহরন। ইসলামিক গানে কীর্তন সুরের ব্যবহারের মত যুগান্তকারী এবং সাহসী চিন্তা নজরুল ছাড়া অন্য কোন কবির রচনায় পাওয়া সত্যিই দুষ্কর।
এরকম আরো কিছু ইসলামিক গানের মধ্যে রয়েছেঃ
ওরে ও দরিয়ার মাঝি মোরে নিয়ে নিয়ে যা রে মদিনা- ভাটিয়ালি সুর
রোজ হাশরে আল্লা আমার করোনা বিচার- ভাটিয়ালি সুর
আহার দিবেন তিনি রে মন, জীব দিয়াছেন যিনি- মারফতি সুর
ওরে কে বলে আরবে নদী নাই- ভাটিয়ালি সুর
আমি আল্লাহ নামের বীজ বুনেছি- ভাটিয়ালি সুর
পুবাল হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে লইয়া- ভাটিয়ালি সুর
এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি- ভাটিয়ালি সুর।

গ্রাম বাংলার আদি এবং অকৃত্রিম সুর কীর্তন। যুগের পর যুগ ধরে কীর্তন ও বাউল সুরে বাংলার পথে ঘাটে লোকগান গীত হয়ে আসছে। কীর্তন সুরে নজরুলের বহু গান রয়েছে। এরকম কয়েকটি গানের মধ্যে রয়েছে-
ওরে নীল যমুনার জল বল রে মোরে বল, কোথায় ঘনশ্যাম, আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম- কীর্তন সুর
তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু- কীর্তন সুর
সখি আমিই না হয় মান করেছিনু তোরা তো সকলে ছিলি- কীর্তন সুর

বাজে মঞ্জুল মঞ্জির রিনিকি ঝিনি নীর ভরণে চলে রাধা বিনোদিনী- কীর্তন সুর।
আধুনিক পর্যায়ের কিছু গানে লোকসুরের প্রভাব রয়েছে।

যেমন: 'আমি গগন গহনে সন্ধ্যা তারা' গানটির সঞ্চারিতে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব রয়েছে। আবার 'মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে', এ গানের কিছু অংশে লোকসুরের প্রভাব আছে। যেমন: 'তারি তরে গো মেঘ-বরন যায় কেশ, বুঝি তাহারি লাগি হয়েছে বৈরাগী' লাইনগুলোতে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব পাওয়া যায়। এরকম আরো কিছু গান:

একাদশীর চাঁদ রে ঐ- কীর্তন সুর

বাসন্তী রঙ শাড়ী পরো খয়ের রঙের টিপ- কীর্তন ভাঙা সুর

আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে- বাউল সুর প্রভাবিত

তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম- লোকসুর প্রভাবিত

যুগ যুগ ধরি লোকে লোকে মোর প্রভুরে খুঁজিয়া বেড়াই- লোকসুর প্রভাবিত

এরকম বহু গানে নজরুল লোকসুরের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ছেলেবেলা থেকেই লোকসংস্কৃতির সব উপাদানের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন তিনি, তাঁর সংগীত ও সাহিত্যে লোকজ প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান।

টিকা ও তথ্য নির্দেশ

১২। তথ্যসূত্র- আবদুস সাত্তার, *নজরুল সংগীত অভিধান*, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, ২৫ মে ১৯৯৩

১৩। *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩, পৃ ১৬

১৪। ওয়াকিল আহমেদ, *নজরুল- লেটো ও লোকসাহিত্য*, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, এপ্রিল ২০০১, পৃ. ৮১

১৫। *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩, পৃ ৬৭৪

১৬। ওয়াকিল আহমেদ, *নজরুল- লেটো ও লোকসাহিত্য*, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, এপ্রিল ২০০১, পৃ. ৮১

১৭। *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩, পৃ ৬৭৬

১৮। *প্রাগুক্ত:* পৃ ১১৮

১৯। আব্দুল আজীজ আল-আমান এম.এ., *নজরুল গীতি (অখন্ড)*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ৪ জুন ১৯৯৯

২০। *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩, পৃ ৭৭

২১। বাবু রহমান, *'মুকুন্দ দাস ও কাজী নজরুল ইসলাম' (প্রবন্ধ)*, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা (নববর্ষ ২য় সংখ্যা, শীত-বসন্ত) ১৩৯৩ (বাং), পৃ ১০৭

২২। *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩, পৃ ৬৬৩

২৩। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৬৭৯

২৪। *প্রাগুক্ত:* পৃ ২২

২৫। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৩০৫

২৬। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৩৯১

২৭। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৭৭৬

২৮। *প্রাগুক্ত:* পৃ ১৩৭

২৯। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৬৮৬

৩০। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৮৭৯

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন মাধ্যমে নজরুলের লোকসুরের গানের বিকাশ

বর্তমান সময়ে যেকোনো শিল্পকর্ম প্রকাশের অসংখ্য মাধ্যম প্রচলিত রয়েছে। মুঠোফোন এবং ইন্টারনেটের সুবাদে যেকোনো শিল্পকর্ম মুহূর্তেই আমাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। বিশ শতকে বিশ ও ত্রিশের দশকে মূলত গ্রামোফোন, বেতার, চলচ্চিত্র, মঞ্চ প্রভৃতি হাতে গোনা কয়েকটি মাধ্যমে সৃজনশীল শিল্পকর্মের প্রচার হত। লেটো ও সৈনিক জীবনের শেষে নজরুল কলকাতার আধুনিক এই প্রতিটি মাধ্যমের সাথে যুক্ত ছিলেন। নজরুল তাঁর লোকসুরের গানগুলো মূলত বানিজ্যিক উদ্দেশ্যেই রচনা করেছেন। গ্রামোফোন, মঞ্চ, বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই নজরুলের লোকসুরের গানের সম্পূর্ন বিকাশ ঘটে। এছাড়াও বিভিন্ন গুনী শিল্পীদের কণ্ঠে গাওয়া এসব গান যুগের পর যুগ শ্রোতার হৃদয়ে অমর হয়ে আছে। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগদান করেন। গ্রামোফোন কোম্পানীতে গীতিকার, সুরকার ও প্রশিক্ষক রূপে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল সম্পূর্নভাবে সংগীতের জগতে প্রবেশ করেন। তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর বিপুল চাহিদা ছিল। এক অসাধারন বিস্ময়কর সৃজনশীলতার প্রভাবে তিনি সকল প্রতিকূলতা জয় করতেন এবং একের পর এক কালজয়ী গান সৃষ্টি করেন। কয়েক কাপ চা আর কয়েকটি পানে খুব সহজেই ভোলানো যেত নজরুলকে। ঘন্টার পর ঘন্টা একটানা গান লেখা ও সুর করায় নিমগ্ন থাকতেন তিনি। গ্রামোফোন কোম্পানীকে বহু গান দিয়েছেন কবি।

সুস্থাবস্থায় তিনি নিজে সব গানের বানী এবং সুর গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারন করিয়েছেন এবং কোনো কোনো সময় তার অনুমতিক্রমে অন্য সুরকার ও শিল্পীদের দিয়ে রেকর্ড করানো হয়েছে। নজরুল লোকসুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন সেই ছেলেবেলা থেকেই কিন্তু লোকসুরে ব্যপকভাবে গান রচনা করার কারনটা ছিল বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে। গ্রামোফোন, বেতার, মঞ্চ, চলচ্চিত্র প্রভৃতি মাধ্যমের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়ানোর পর অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে, বানিজ্যক প্রসারের প্রয়োজনে তাকে বহু বহু ধরনের গান রচনা করতে হয়েছিল। রেকর্ড ও সবাকচিত্রের মাধ্যমেই মূলত নজরুল রচিত লোকসুরের গানগুলো প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। লোকসংগীতের কাঠামো এবং সুরবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সেইসব যুগান্তকারী সৃষ্টি এই রেকর্ডগুলোর মাধ্যমে আজও আমাদের নিয়ে যায় শেকড়ের সন্ধানে। এ পর্যায়ে গ্রামোফোন, নাটক, চলচ্চিত্র, বেতারে প্রচারিত সেই গানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

গ্রামোফোন

বিংশ শতকের প্রথম দশকে কলকাতায় গ্রামোফোন নামক আধুনিক রেকর্ড প্লেয়ারের জনপ্রিয়তা শুরু হয়। ১৯২৮ সালে নজরুল সুরকার ও সংগীতকার হিসেবে গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদান করেন এবং ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয়ভাবে শ্রুতিনির্ভর এই মাধ্যমের সাথে যুক্ত ছিলেন। সুস্থাবস্থায় এইচ এম ভি, টুইন কোম্পানী, সেনোলা, কলম্বিয়া, পাইওনিয়ার, ভিয়েলো ফোন, মেগাফোন, হিন্দুস্থান রেকর্ড প্রভৃতি কোম্পানিতে তিনি গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, প্রশিক্ষক, অভিনেতা, নাট্যকার ইত্যাদি ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেছেন। কবি অসুস্থ হবার পরেও বহু শিল্পী, সুরকার এবং সংগীত পরিচালকের মাধ্যমে বিভিন্ন রেকর্ডে তাঁর গান প্রচারিত হয়েছে। তাঁর সংগীতের মাধ্যমে গ্রামোফোন কোম্পানি গুলো যেমন জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তেমনি বহু শিল্পী এসব গান গেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য লোকসুরের গান রচনা করেছেন কবি। বেশিরভাগ অনুষ্ঠান হত বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে এবং শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী।

নজরুলের লোক আঙ্গিকের গানগুলো গ্রামোফোনে প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিছু গানের উল্লেখ করা হল এ পর্যায়েঃ

১। কালো পাহাড় আলো করে
কে ওরে কালো শশী
নিতুই এসে লো বাজায় বাঁশী
কদম তলায় বসি-

এইচ এম ভি, রেকর্ড নম্বরঃ এন. ১৭৩৭০, শ্রেনিঃ ঝুমুর, শিল্পীঃ মিস আঙ্গুরবালা।

২। হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙ্গা পলাশ ফুল
এনে দে, এনে দে নৈলে বাঁধব না বাঁধব না চুল।
হিন্দুস্থান কোম্পানি, রেকর্ড নম্বরঃ এইচ ১১৭৭৯, শ্রেনিঃ ঝুমুর(সাঁওতালী),
সমবেত সঙ্গীত, সাপুড়ে চলচ্চিত্রের গান।

৩। নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী নয় নাচে কালো আঁখি

মেগাফোন কোম্পানি, রেকর্ড নম্বরঃ কে.এস.কে. ৬, শ্রেনিঃ ভাওয়াইয়া, শিল্পীঃ আব্বাস উদ্দীন আহমেদ।

৫। চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে

চোখ গেল পাখি

হিন্দুস্থান কোম্পানি, রেকর্ড নম্বরঃ এইচ-৯৯৬, শিল্পীঃ শচীন দেব বর্মন

৬। আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল আমার দেউল

এইচ এম ভি, রেকর্ড নম্বরঃ এন ৩৮৩৩, শ্রেণীঃ বাউল, শিল্পিঃ ধীরেন দাস

৭। পদ্মার ঢেউরে মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা, যারে

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি, রেকর্ড নম্বরঃ এইচ ৯৬৯, শ্রেনিঃ ভাটিয়ালি, শিল্পিঃ শচীন দেব বর্মন।[৩১]

বেতার

১৯৩৮ সালে কলকাতা বেতারের তৎকালীন সংগীত পরিচালক, সংগীত বিশারদ সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর উদ্যোগ এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় নজরুল বেতারের সঙ্গে যুক্ত হন। বেতারে কবির গানের অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল। হারামনি, গীতিচিত্র, নবরাগমালিকা এই অনুষ্ঠানগুলোতে পর্যায়ক্রমে রাগাশ্রয়ী, সংস্কৃত ছন্দের গান, আধুনিক, লোকসুরের গান প্রচারিত হত।

লোকসুরের গান নিয়ে সাজানো বেশ কিছু সংগীতালেখ্যর মধ্যে একটি ছিল 'পদ্মার ঢেউ'। এটি বাউল ও ভাটিয়ালি সুরের গানের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছিল। এই গীতিচিত্রের গানগুলো ছিল -

১। পদ্মার ঢেউরে মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা - এইচ ৯৬৯, শিল্পী: শচীন দেব বর্মন

২। চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে - ঐ

৩।ও বন্ধু দেখলে তোমায় - এন-১৭১৮৫, পদ্মা রানী চ্যাটার্জী

৪। এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে - এন-১৭৪১৪, মৃনালকান্তি ঘোষ

৫। ওরে ভাটির নদী লয়ে যাও মোরে - সুর লুপ্ত

৬। ও বন্ধুরে আমার অকালে ঘুম ভাঙ্গাইয়া- সুর লুপ্ত।[৩২]

অন্য একটি গীতিচিত্র হচ্ছে 'যাযাবর' ।এখানে যে গানগুলো ছিলঃ

১। বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয় শিল্পী: সীতা দেবী, রেকর্ড নং- এন-৯৯৬০

২। চিকন কালো বেদের কুমার, শিল্পী: রীনা চৌধুরী, রেকর্ড নং- এন-২৭২৬২

৩। ছন্নছাড়া বেদের দল-জে,এন জি-৫৫০৭ শিল্পী: ভবানী দাস, পরেশ দেব ও করুনা ঘোষ

৪। আয়লো বনের বেদিনী- বনের বেদে রেকর্ড নাটিকা

৫। এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা- সুর লুপ্ত।[৩৩]

১৯৩৪ সালে প্রচারিত 'ঝুমুর' নামে অন্য একটি গীতিচিত্রে প্রচারিত ঝুমুর অঙ্গের গানগুলো ছিল-

১। মাদল বাজিয়ে এল বাদলা মেঘ

২। ওরে ডেকে দে লো মহুয়া বনে- শৈল দেবী

৩। ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এলো গো- মৃনালকান্তি ঘোষ

৪। বল সই বসে কেন একা আনমনে- মন্টু রানী।[৩৪]

১৯৪০ সালে প্রচারিত হয়েছিল লোকগীতি নির্ভর অনুষ্ঠান ' বাংলার গ্রাম' । এ অনুষ্ঠানের গানগুলো ছিল-

২। মোরা বিহান বেলা উঠিরে ভাই- গনেন চক্রবর্তী

৩। আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল- ধীরেন দাস

৪। উজান বাওয়ার গান গো এবার- সুর লুপ্ত

৫। গাঙ্গে জোয়ার এল ফিরে- আব্বাসউদ্দীন আহমদ

৬। চিকন কালো বেদের কুমার- বীনা চৌধুরী।[৩৫]

চলচ্চিত্র

কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার স্বাক্ষর বাংলা গানের কোথায় নেই সেকথা বলা মুশকিল। তিনি একাধারে যেমন কবি, ঔপন্যাসিক,নাট্যকার,সংগীতকার ছিলেন,আবার জীবনের একটা সময়ে আমরা তাঁকে পাই চলচ্চিত্রকার,অভিনেতা,পরিচালক,সংগীত পরিচালক,চলচ্চিত্রের সংলাপ রচয়িতা হিসেবে। আধুনিক যুগে প্রচার শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্র প্রধান এবং বিশেষ একটি মাধ্যম। শিল্প মাধ্যমের এই জগতটি থেকে দূরে সরে থাকলে কোন শিল্পীই যেন সম্পূর্ন হতে পারেন না। তথ্যসূত্রে জানা আয় ১৯৩১ সালে সবাক চলচ্চিত্রের শুরুর দিকেই নজরুল চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত হন এবং এর সাথে সাথে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। ১৯৩১ সালে কলকাতায় ম্যাডান থিয়েটার্স এ সবাক চিত্রে অংশগ্রহণকারী নট-নটীদের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে 'সুর ভাণ্ডারী' হিসেবে কাজী নজরুলকে নিযুক্ত করা হয়। সেই থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নজরুল বেশ কয়েকটি বাংলা ও হিন্দী চলচ্চিত্রে পরিচালনা, অভিনয়, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচয়িতা, সংগীতায়োজন ও গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এসব চলচ্চিত্রের মধ্যে ধ্রুব, পাতালপুরী, নন্দিনী, গ্রহের ফের, বিদ্যাপতি (বাংলা ও হিন্দি), গোরা, সাপুড়ে (বাংলা ও হিন্দি), চৌরঙ্গি (বাংলা ও হিন্দি), দিকশূল, অভিনয় নয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে নজরুল রচিত লোকসুরের গানের ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। এ পর্যায়ে সেসব গান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলঃ

পাতালপুরী চলচ্চিত্র

শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'পাতালপুরী' বাণীচিত্রটি কালী ফিল্মস এর ব্যানারে ১৯৩৫ সালের ২৩ মার্চ কলকাতার রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এ ছায়াছবির সংগীত পরিচালনায় ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। বর্ধমানের কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনাচরণের উপর ভিত্তি করে এ চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মিত হয়। নজরুল এ চলচ্চিত্রের গান রচনার জন্য সরাসরি বর্ধমানের কয়লাখনি অঞ্চলে যান এবং কুলি কামিনদের জীবনযাত্রা ও সহজ সরল সুরে ও তালে গাওয়া গান আত্মস্থ করেন। এ চলচ্চিত্রের গানে ঝুমুর ও সাঁওতালি সুরের সম্মিলন ঘটিয়েছেন তিনি। কবি রচিত ও সুরারোপিত এ চলচ্চিত্রের গানগুলো ছিলঃ

১। আঁধার ঘরের আলো
ও কালো শশী
আঁধার ঘরের আলো
কে বলে তোরে কালো
ওই রূপে মন ভুলালো।
তোরই রূপের মোহে
আমি মরি বিরহে
যত পরান দহে
তত বাসি যে ভালো

২। এলো খোঁপায় পরিয়ে দে
পলাশ ফুলের কুঁড়িলো
পরিয়ে দে বেলোয়ারী চুড়ি।
কালো শশী বনে আবার
বাজালো বাঁশরী লো বাজালো বাশুরী।।

৩। ও শিকারি মারিস না তুই
মানিক জোড়ের একটি হে।
সাথী-হারা পাখীটিও মরিবে বঁধুর বিরহে
একা পাখীর শাপ লেগে
(হে) যাবে সুখের ঘর ভেঙে
পাখী মারা তীর এসে তোর
বিঁধবে আমার বুকে হে।

৪। তালপুকুরে তুলছিল সে
শালুক সুজির ফুল রে
শালুক সুজির ফুল।
ঢুলু ঢুলু চোখেরে তাঁর এলোমেলো চুল।।

৫। ধীরে চল চরণ টলমল
সখী নতুন মদের নেশা
পিয়েছি বিষ মেশা
চলতে পথে উঠি চমকে।
একি খাওয়ালো মুখপোড়া কালো ছোঁড়া
ওঠে অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে ছমকে ।।

৬। দুখের সাথী গেলি চলে
কোন সে দেশে বিহান বেলা
ও তুই মাঠে আছিস লুকিয়ে বুঝি
তাই মাটি খুঁড়ে তোকে খুঁজি।

৭। দ্বৈত কণ্ঠের গান
পুঃ ফুল ফুটেছে কয়লা-ফেলা
ময়লা টবে ঝুড়িতে
আমি বাউরি হয়ে উড়ে যাবো
উড়ে যেমন ঘুড়িতে।
স্ত্রীঃ তোর বিরহে ময়লা ছোঁড়া
বুড়ি হলাম কুড়িতে
পুড়ে হলাম কয়লা পোড়া
আর পারিনা পুড়িতে।

পাতালপুরী চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই নজরুলের ঝুমুর সুরে গান রচনার সূচনা ঘটে । এ গানগুলোতে সাঁওতালী সুরের সাথে ঝুমুর সুরের সংমিশ্রন ঘতিয়েছেন তিনি যা ঝুমুর গানে এক অনন্য সংযোজন। এ চলচ্চিত্রের বেশিরভাগ গানই শিল্পী কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে গীত হয়েছিল।[৩৬]

সাপুড়ে চলচ্চিত্র

দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'সাপুড়ে' চলচ্চিত্রটি ১৯৩৮ সালের ২৭ মে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় মুক্তি পায়। এই ছায়াছবির কাহিনীকার ছিলেন নজরুল। পাশাপাশি সাতটি গানের সুর সংযোজন ও গীত রচনা এবং শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তিনি। এ ছবির সংগীত পরিচালনায় ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। পাহাড়ী সান্যাল ও কাননদেবী অভিনীত চলচ্চিত্রটি হিন্দি ভাষাতেও প্রচারিত হয় এবং বাংলা, বম্বে, করাচীতেও তুমুল জনপ্রিয়তা পায়।

সমাজের অবহেলিত সাপুড়েদের জীবনকাহিনী ছিল এ চলচ্চিত্রের বিষয়। সম্ভবত কাজী নজরুল ইসলামের আগে বেদে বেদেনীদের নিয়ে এধরনের পদক্ষেপ কোন সাহিত্যিক নেননি। এ চলচ্চিত্রের গানগুলো প্রায় সবই লোক আঙ্গিকের। গানগুলোর সুর এবং বানীভাগে লোক সংগীতের উপাদান সুস্পষ্ট। এ চলচ্চিত্রের গানগুলো ছিলঃ

১। হলুদ গাঁদার ফুল
রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে
নৈলে রাঁধব না বাঁধব না চুল।

এটি ছিল সাঁওতাল নাচের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের একটি ঝুমুর গান।

২। আকাশে হেলান দিয়ে
পাহাড় ঘুমায় ঐ
ঐ পাহাড়ের ঝর্না আমি
ঘরে নাহি রই গো
উধাও হয়ে বই।

এ গানটি গেয়েছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী কাননদেবী। তিনি এ চলচ্চিত্রের মূল অভিনেত্রীর ভুমিকায় অভিনয় করেছিলেন। প্রধান নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার কারনে গানটির সঠিক ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য নজরুল তাঁকে বলেছিলেন-

> মনে মনে এঁকে নাও- নীল আকাশ-দিগন্ত ছড়িয়ে আছে, তার সীমা নেই-দুদিক ছড়ানো তো ছড়ানোই। পাহাড় যেন নিশ্চিন্ত মনে তারই গায় হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আকাশের উদারতার বুকে এই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমানোটা প্রকাশ করতে হলে সুরের মধ্যেও একটা আয়েস আনতে হবে তাই একটু ভাটিয়ালির ভাব দিয়েছি। আবার ঐ পাহাড় ফেটে যে ঝর্না বেরিয়ে আসছে, চঞ্চল আনন্দকে সে কেমন করে ফোটাবে? সেখানে সাদামাটা সুর চলবেনা, একটু গীটকিরী তানের ছোঁয়া চাই তাই রো -ও-ও-ও-ওই বলে ছুটলো আত্মহারা আনন্দে।[৩৭]

৩। কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো
শ্বশুর সওদাগর
ঐ মান্দাসে চড়ে যাবে বেউলা-লক্ষীন্দর।

৪। দেখি লো তোর হাত দেখি
হাতে হলুদ গন্ধ
এলি রাঁধতে রাঁধতে কি ?
মনের মতন বর পেলে
নয় কন্যা নয় ছেলে
চিকত আঙ্গুল দীঘল হাত
দালানবাড়ি ঘরে ভাত।
শিল্পীঃ কৃষ্ণচন্দ্র দে ।

৫। কথা কইবে না কথা কইবে না বৌ
তোর সাথে তার আড়ি-আড়ি-আড়ি।
(বৌ) মান করেছে, যাবে চলে আজই বাপের বাড়ি।

৬। পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম
হিজল ফুলের মালা
কি করি এ মালা নিয়ে বল চিকত কালা।

৭। ফুটফুটে ঐ চাঁদ হাসেরে
ফুল ফুটানো হাসি।
হিয়ার কাছে পিয়ায় ধরে
বলতে পারি আজ যেন রে হইব উদাসী।

‘সাপুড়ে’ ছায়াছবির গান এবং কাহিনী পুরোটাই ছিল বেদে-বেদেনীদের জীবন আলেখ্য ভিত্তিক। নজরুল নিজেই পাড়াগাঁয়ের বেদে-বেদেনী দের আস্তানায় গিয়ে তাদের সুর আয়ত্ত করে এ চলচ্চিত্রের গানে ব্যবহার করেছেন। ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে এর কাহিনী গড়ে ওঠার উল্লেখ করেছে। আবার নজরুল গবেষক আব্দুল কাদির বলেছেন সাপুড়ের রচনায় ‘মহুয়া’,’মনজুরমা’ এবং ‘পীরবাতাসী’ এই তিনটি পালাগানের প্রভাবের কথা।[৩৮]

নন্দিনী চলচ্চিত্র

কে.বি.পিকচার্সের প্রযোজনায় ‘নন্দিনী’ ছায়াছবি ১৯৪১ সালের ৮ নভেম্বর কলকাতার রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। কাজী নজরুল এই চলচ্চিত্রের ৯ টি গানের মধ্যে ১ টি গানের রচনা, সুরারোপ এবং প্রশিক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিলেন। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন হিমাংশু দত্ত সুর-সাগর। ছবির পরিচালক শৈলজানন্দের অনুরোধে নজরুল একটি গান রচনা করেন। ঝুমুর ও ভাটিয়ালির অপূর্ব মিশ্রণে কালজয়ী সেই গানটি ছিল-

চোখ গেল চোখ গেল
কেন ডাকিসরে
চোখ গেল পাখিরে
চোখ গেল পাখি
তোর চোখে কাহারও চোখ পড়েছে নাকি রে।

গানটি গেয়েছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী শচীনদেব বর্মন। চলচ্চিত্রে এ গানের মাধ্যমেই তাঁর শুভ সূচনা ছিল এবং শ্রোতার কাছে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তিনি। আজও এ গানটি নজরুলের লোকসুরের গানের মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করে আছে।

গানটি পরবর্তীতে উর্বশী চিত্রমের প্রযোজনায় ‘বারবধূ’ ছায়াছবিতে কিংবদন্তী শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত হয়েছে।[৩৯]

সিরাজদ্দৌলা চলচ্চিত্র

বাংলাদেশে ১৯৬৭ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব খান আতাউর রহমানের ‘সিরাজদ্দৌলা’ চলচ্চিত্রে কবির একটি লোকসুরের গান ব্যবহার করা হয়েছিল। বিখ্যাত শিল্পী আব্দুল আলিমের কণ্ঠে গীত গানটি ছিল ‘নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এইতো নদীর খেলা’।[৪০]

চৌরঙ্গী চলচ্চিত্র

১৯৪২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতা রূপবানী প্রেক্ষাগৃহে এমপায়ার্স ডিস্ট্রিবিউটার্স এর পরিবেশনায় মুক্তি পায় ছায়াছবি 'চৌরঙ্গী (বাংলা)'। এ ছবিতে গীত রচনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন নজরুল। এ চলচ্চিত্রে লোকসুরের ১ টি গান ছিল। গানটি ছিলঃ

'সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো
পেট ভরে ভাত পাইনা ধরে আসে হাত গো
শিল্পী- মীরা , আভা, মৃদুলা, রেণুকা প্রমুখ।[৪১]

নাটক

বাল্যকালে যে নজরুলকে পালাধর্মী নাটক দেখা যায় এবং যার জীবন সংগ্রামের পদে পদে নাটকীয়তা সুস্পষ্ট, পরিনত বয়সে নাটক রচনার সাথে যুক্ত হওয়া তাঁর জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ঘটনা। নাট্যাঙ্গনে নজরুলের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে নাট্যকার, অভিনেতা, সংগীত পরিচালক, সুরকার, গীতিকার এবং কাহিনীকার হিসেবে। ১৯২৩ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন রেকর্ড নাটিকা, গীতিনাট্য ও মঞ্চ নাটকের সাথে জড়িত ছিলেন বিভিন্ন ভূমিকায়। বেতার এবং নাট্যমঞ্চের জন্য বেশ কিছু নাটক কবি নিজেই রচনা করেছেন এবং কিছু নাটকের সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এসব নাটকের মাধ্যমে প্রচারিত নজরুলের বেশ কিছু লোকসুরের গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এসব গান এখনও নজরুল সংগীত শিল্পীরা সমান জনপ্রিয়তায় পরিবেশন করে থাকেন। নিজের লেখা নাটকে এবং অন্য রচয়িতার নাটকে তিনি গীতিকার এবং সুরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নিজের লেখা যেসব নাটকে তাঁর গান ছিল সেগুলোর তালিকা এ পর্যায়ে উল্লেখ করা হলঃ
মদিনা নাটকে ৪৩ টি গান
মধুমালা নাটকে ৩৭ টি গান
আলেয়া নাটকে ২৮ টি গান
বিদ্যাপতি নাটকে ২৩ টি গান
বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকে ১৪ টি গান
শাল পিয়ালের বনে নাটকে ১০ টি গান
অতনুর দেশ নাটকে ৮ টি গান
পুতুলের বিয়ে নাটকে ৭ টি গান

সেতুবন্ধ নাটকে ৬ টি গান

বিজয়া নাটকে ৬ টি গান

হরপ্রিয়া নাটকে ৬ টি গান

গুল-বাগিচা নাটকে ৬ টি গান

বনের বেদে নাটকে ৬ টি গান

শ্রীমন্ত নাটকে ৫ টি গান

পুরানো বলদ নতুন বৌ নাটকে ৫ টি গান

ঝিলিমিলি নাটকে ৪ টি গান

ভুতের ভয় নাটকে ৪ টি গান

ঈদ নাটকে ৩ টি গান ইত্যাদি।[৪২]

অন্য রচয়িতাদের যেসব নাটকে কবির গান ছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাটক এবং গানের সংখ্যা এ পর্যায়ে তুলে ধরা হলঃ

মন্মথ রায়ের সুরথ-উদ্ধার (১৯৩৬) নাটকে ৮ টি গান, মহুয়া (১৯৪০) নাটকে কয়েকটি, লাইলি মজনু নাটকে ১৩ টি, নরমেধ নাটকে কয়েকটি এবং কাফনচোরা (১৯৪০) নাটকে কয়েকটি গান,

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা (১৯৩৮) নাটকে ৬ টি গান

জগত ঘটকের উদাসী ভৈরব (১৯৩৯) নাটকে ৪ টি ও ঝুলন (১৯৩৯) নাটকে ৫ টি গান,

প্রণব রায়ের জবা ও চন্দন নাটকে ৭ টি এবং বর্নচোরা ঠাকুর নাটকে ১ টি গান,

মনিলাল বন্দোপাধ্যায়ের অন্নপূর্না (১৯৪০) নাটকে ১৪ টি গান,

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের ব্ল্যাক আউট নাটকে ২ টি গান,

দেবেন্দ্রনাথ রাহার অর্জুন বিজয় নাটকে ৫ টি গান,

সুধীন্দ্রনাথ রাহার সর্বহারা নাটকে ৭ টি গান ইত্যাদি।[৪৩]

বেশ কিছু নাটকে লোকসুরের গানের ব্যবহার ছিল। এ পর্যায়ে কিছু উল্লেখযোগ্য নাটকে পরিবেশিত নজরুলের লোকসুরের গান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলঃ

মহুয়া নাটক

১৯২৯ সালে মনোমোহন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় বিখ্যাত পরিচালক মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' নাটকটি। এ নাটকে নজরুল রাগাশ্রয়ী সুরের সাথে লোকসুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অপূর্ব কিছু গান সৃষ্টি করলেন। গানগুলো ছিল-

১। মহুল গাছে ফুল ফুটেছে, ঝুমুর সুর, শিল্পী-আঙ্গুরবালা দেবী

২। ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয়- ভাটিয়ালি সুর, শিল্পী- কমল দাশগুপ্ত

৩। আমার গহীন জলের নদী- ভাটিয়ালি সুর, শিল্পী- ধীরেন দাস

৪। তোমায় কূলে তুলে বন্ধু- ভাটিয়ালি সুর, শিল্পী-ধীরেন দাস।[৪৪]

১৯৩৮ সালে নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ শচীন সেনগুপ্ত পরিচালিত ' সিরাজদৌলা' নাটকে নজরুল রচিত ও সুরারোপিত একটি ভাটিয়ালি সুরের গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। প্রখ্যাত শিল্পী মৃনালকান্তি ঘোষের কণ্ঠে গীত গানটি ছিল-

'নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এইতো নদীর খেলা
সকাল বেলা আমির রে ভাই ফকির সন্ধ্যাবেলা'[৪৫]

দেবী দুর্গা নাটক

১৯৩৯ সালের ১৮ অক্টোবর মিনার্ভা থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত 'দেবী দুর্গা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকের সংগীতায়োজনে ছিলেন নজরুল। নাটকটিতে ঝুমুর সুরের গান ছিল ১ টি।

মহুয়া মদ খেয়ে যেন বুনো মেয়ে
(চৈতি রাতে লো) নিশির চাঁদ ঢুলে আবেশে।[৪৬]

অর্জুন বিজয় নাটক

১৯৪০ সালের ৭ ডিসেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে দেবেন্দ্রনাথ রাহার 'অর্জুন বিজয়' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এতে নজরুল রচিত লোকসুরের গান ছিল ১ টি।

ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এলো
শিল্পী- মৃনালকান্তি ঘোষ

টিকা ও তথ্যনির্দেশ

৩১। ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬

৩২। ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *বেতারে নজরুল ও তাঁর গান*, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ ৭৫

৩৩। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৭৩

৩৪। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৮২

৩৫। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৮৭

৩৬। অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্র জগতে নজরুল*, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, আশ্বিন ১৪০৫, পৃ ৬৩-৬৪

৩৭। করুনাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৌষ ১৩৮৪, পৃ ৬৮

৩৮। *চলচ্চিত্রে নজরুল*, আসাদুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, পৃ ৮৯

৩৯। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৮৯

৪০। *প্রাগুক্ত:* পৃ ১৫৫

৪১। *প্রাগুক্ত:* পৃ ১১১

৪২। অনুপম হায়াত, *নাট্যাঙ্গনে নজরুল*, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, চৈত্র ১৪০৩, পৃ ১১

৪৩। *প্রাগুক্ত:* পৃ ১২

৪৪। ড. ব্রম্মমোহন ঠাকুর, *বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান*, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমী, নভেম্বর, ১৯৯৫, পৃ ১৩

৪৫। *প্রাগুক্ত:* পৃ ১৩

৪৬। *প্রাগুক্ত:* পৃ ৪১

চতুর্থ অধ্যায়

লোকসুরে নজরুলের গানের রূপকার

লোকসংগীত বাঙালির একান্ত আপন। আবহমান কাল ধরে বাংলার সংস্কৃতি, জীবনধারা, পরিবেশগত বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে লোকসংগীত মানুশের মুখে মুখে রচিত ও গীত হয়ে আসছে। সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের সাথে সাথে লোকগানের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটছে প্রতিনিয়ত। অন্যান্য অঙ্গের গান অপেক্ষা লোকসুরের গান শ্রোতার হৃদয়ে খুব সহজেই জায়গা করে নিতে পারে। এর কারন মাটির সাথে মানুষের সম্পর্ক মা ও সন্তানের মত। গ্রাম বাংলার মেঠোপথ থেকে শহুরে নাগরিক শ্রোতামহলে এই চিরায়ত সুর পৌঁছে দিতে পারেন অবশ্যই একজন গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী। বঙ্গভঙ্গের সময় লোকসুরে স্বদেশী গান রচনায় বিপুল উৎসাহ দেখা যায় বাংলায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন তাঁদের গানে হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতির সাথে লোকসুরের সংমিশ্রন ঘটিয়েছেন এবং পরবর্তীতে বাংলার এই আবহমান সংগীতধারার প্রতি নাগরিক সংস্কৃতিবান সংগীতরচয়িতাদের আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে লোকসুরের গান, লোকসাহিত্য, দর্শন সম্পর্কে বাঙ্গালী গবেষক, সুরকার ও সংগ্রাহকদের ব্যাপক উৎসাহ এবং সৃষ্টি কর্মের দ্যোতনা ঘটে।

গ্রামোফোন কোম্পানী, বেতার, চলচ্চিত্র, নাটক প্রভৃতি মাধ্যমেও লোকসংগীতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। গ্রামোফোন কোম্পানীকে কেন্দ্র করে বাংলায় লোকসংগীতের অসামান্য রূপকার আবাসউদ্দিনের অভ্যুদয়। আব্বাসউদ্দীনের পরিবেশনায় বাংলায় লোকসংগীত আরো অনেক বেশী প্রানবন্ত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি কাজী নজরুল ইসলামকে লোকসংগীতানুগ গান রচনায় অনুপ্রানিত করেন।

নজরুলের লোকসুরের গানগুলো রচনার মূলে ছিল বানিজ্যিক উদ্দেশ্য। গ্রামোফোন কোম্পানী, বেতার, মঞ্চনাটক ও চলচিত্রের প্রয়োজনে তিনি বেশ কিছু লোকসুরের গান রচনা করেছিলেন। সেইসব গান বিভিন্ন বিখ্যাত শিল্পীদের কণ্ঠে ভীষন জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আবার কিছু কিছু গান গেয়ে বহু শিল্পী শ্রোতা কূলে জনপ্রিয় হয়েছে। এ পর্যায়ে নজরুলের লোকসুরের গানের শিল্পীদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হলঃ

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

বিখ্যাত শিল্পী আব্বাসউদ্দীনকে পল্লীগীতি সম্রাট নামে এককথায় অভিহিত করা যায়। তিনি ছিলেন বাংলার আপামর জনসাধারন তথা জন নন্দিত শিল্পী যার অনন্য কণ্ঠস্বর, পাগল করা হৃদয়গ্রাহী সুরে গীত হয়েছে শত শত গান। ছোটবেলা থেকেই মোরগ ডাক, ঘুঘু, পায়রা, ব্যাঙের ঘ্যাঙ্গর ঘ্যাঙ্গর ডাক, কোকিলের কুহু স্বর, বউ কথা কও পাখীর ডাক শুনে শুনে অনুকরন করতেন তিনি। গ্রামোফোন কোম্পানীতে প্রথম রেকর্ডের পর থেকে তিনি একের পর এক ইসলামী গান, আধুনিক গান ও বিশেষ করে লোকসুরের গানে ভীষন রকম জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। গ্রামোফোন কোম্পানীকে কেন্দ্র করেই বাংলা গানে আবাসউদ্দীনের অভ্যুদয়। লোকসংগীতের অসামান্য রূপকার হিসেবে আব্বাসউদ্দীন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি নজরুল ইসলামকে লোকসুরের গান রচনায় অনুপ্রানিত করে তোলেন। কবি গোলাম মোস্তফা আব্বাসউদ্দীনের সম্পর্কে বলেছেন- "বাংলা গজল এবং ইসলামী গান নিঃসন্দেহে নজরুলের এক অপূর্ব সৃষ্টি, কিন্তু জানিনা এই নতুন সৃষ্টি পূর্নরূপে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠতো কিনা যদি না সুরের দুলাল আব্বাসউদ্দীন তার পাশে এসে দাঁড়াত। উভয়ের মধ্যে মনিকাঞ্চন সংযোগ হয়েছিল।"[৪৭]

কবি নজরুলের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় কুচবিহারে। নজরুলের লোকসুরের গানগুলো তার মাধুর্যময় কণ্ঠ ও বৈশিষ্ট্য মন্ডিত গায়কীতে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাকি লোকসংগীতের গায়ক হিসেবে আব্বাসউদ্দীন যে জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাভ করেছেন তার তুলনা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাঁর গাওয়া জনপ্রিয় কিছু লোকসুরের গানের উল্লেখ করা হল এ পর্যায়েঃ

১। নদীর নাম সই অঞ্জনা - জে এন জি ৬

২। পদ্ম দীঘির ধারে ওই - জে এন জি ৬

৩। কুঁচ বরন কন্যারে তোর- এফ.টি. ২২২৭

৪। গাঙ্গে জোয়ার এল ফিরে - এন ১৭৪৪৩

৫। ওরে ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি- এফ.টি. ২৮১৮

৬। ওরে ও দরিয়ার মাঝি

৭। ওরে কে বলে আরবে নদী নাই।[৪৮]

শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ পল্লীগীতি সম্রাট হিসেবে আখ্যায়িত হলেও তিনি নজরুল সংগীতের অসামান্য একজন রূপকার হিসেবে গন্য। তাঁর সুরেলা এবং মাধুর্যময় কণ্ঠে নজরুলের লোকসঙ্গীতের পাশাপাশি ইসলাম গানও সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তাঁর গলায় এসব গান শ্রোতার কাছে অসামান্য গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছিল এবং নজরুল সংগীতের জনপ্রিয়তায় তার অবদান ঐতিহাসিক।

আঙ্গুরবালা দেবী

স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী আঙ্গুরবালা দেবী নজরুল সংগীত রূপায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। সহজাত সংগীত প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী নজরুলের বিভিন্ন আঙ্গিকের বহু গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। নজরুলের লোকসুরের বেশ কিছু গান আঙ্গুরবালা দেবী গেয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গান হচ্ছে:

কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল গো

সাপের মনি বুকে করে

কালো পাহাড় আলো করে কে

নাচের নেশার ঘোর লেগেছে

উল্লেখ্য প্রতিটি গানই লোকসুরের অনন্য উদাহরন এবং বিখ্যাত এই শিল্পীর কণ্ঠে গানগুলো ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল।

শচীন দেব বর্মন

শচীন দেব বর্মন বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশের কিংবদন্তী এক শিল্পীর নাম। একাধারে তিনি শিল্পী, গায়ক, সুরকার, গীতিকার এবং সংগীত পরিচালক হিসেবে খ্যাত। লোকসংগীত ও রাগসংগীতের মিশ্রন ঘটিয়ে এক নতুন আঙ্গিকের সুরের প্রবর্তন করেন তিনি। কাজী নজরুল ইসলামের বেশ কয়েকটি গান গেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এবং তাঁর কণ্ঠে গীত গান গুলোও শ্রোতার কাছে অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। লোকসুরের গানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'চোখ গেল চোখ গেল' গানটি শচীন দেব বর্মনের কণ্ঠে অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তিনি অবাঙালি হওয়া স্বত্বেও নজরুলের গান অত্যন্ত যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারন করেছেন। বেশ কিছু গান তার কণ্ঠে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর কণ্ঠে গীত কিছু গান-

১।পদ্মার ঢেউরে

মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা, যা রে- গ্রামোফোন রেকর্ড নম্বর ৯৯৬

২। মেঘলা নিশি ভোরে, মন যে কেমন করে- গ্রামোফোন রেকর্ড নম্বর ৮৫৭

৩।চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে, চোখ গেল পাখি- চলচ্চিত্র-নন্দিনী, গ্রামোফোন রেকর্ড নম্বর ৯৯৬[৪৯]

'নন্দিনী' চলচ্চিত্রের পরিচালক এবং কাহিনীকার শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ 'সুর সভায় নজরুল' থেকে কিছু স্মৃতি তুলে ধরা হলঃ

চোখ গেল পাখীরে- - - -' শিল্পীও তাঁর সামনেই বসে। ঠিক হল শচীনদেবই গাইবেন এ গান। শেখানো শুরু হয়ে গেল। কিন্তু অসুবিধা বাঁধল প্রথম লাইনেই। শচীনবাবু ছিলেন পার্বত্য ত্রিপুরার রাজকুমার। বিরাট সংগীত প্রতিভা এবং সুরেলা কণ্ঠ থাকা সত্ত্বেও নিখুঁত বাংলা উচ্চারণে তাঁর অসুবিধা হতো। 'চোখ গেল চোখ গেল' বার বার তিনি বলতে লাগলেন চো -গেল চো -গেল। খ উচ্চারণটি সাইলেন্ট হয়ে যেতে লাগল। নজরুলও ছাড়ার পাত্র নন। প্রায় আধা ঘণ্টা দুজনের কসরত চললো। গুরু এবং শিষ্যের সে কি নিষ্ঠা। প্রায় আধঘণ্টা চেষ্টার পর সফল হলেন কুমার শচীন দেব।[৫০]

কালিপদ সেন

কালিপদ সেনের কণ্ঠে নজরুলের বেশ কিছু সংখ্যক লোক সুরের গান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আসলে নজরুলের লোকসুরের গান সংখ্যায় খুব বেশী নয়। বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে রচিত এসব গান এই শিল্পীর কণ্ঠে খুব বেশী গীত হয়নি। কালীপদ সেনের কণ্ঠে গীত কিছু উল্লেখযোগ্য গান-

১। কুনুর নদীর ধারে

২। ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে

৩। ওরে গোরাখা রাখাল

মৃনাল কান্তি ঘোষ

জনপ্রিয় শিল্পী মৃনালকান্তি ঘোষের কণ্ঠে নজরুলের অসংখ্য লোকসুরের গান গীত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গান হচ্ছে:

১। ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এলো গো

২। মেঘ বরন কন্যা থাকে মেঘমতীর দেশে

৩। আমি কুল ছেড়ে চলিলাম ভেসে

৪। নিশি পবন নিশি পবন ফুলের দেশে যাও

৫। বন বিহঙ্গ যাওরে উড়ে

৬। নদীর একূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে এইতো নদীর খেলা

৭। বাঁশি বাজায় কে কদম তলায়

মৃনালকান্তি ঘোষের কণ্ঠে এসব গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এছাড়াও শিল্পী গোপাল চন্দ্র সেন, কুমারী আভা সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ দাস, শান্তা বসু, সুধীর দত্ত, মিস প্রমোদা, রঞ্জিত মন্ডল, মিস

আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী পদ্মরানী চট্টোপাধ্যায়, সীতা দেবী, শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র (ফেলু বাবু) প্রমুখ গুনী শিল্পীদের কণ্ঠে নজরুলের লোকসুরের গানগুলো অসামান্য রূপ ধারণ করে এবং আজও শ্রোতৃহৃদয়ে অসামান্য স্থান দখল করে আছে। উল্লেখ্য যে, এইসব গুনী শিল্পীর কণ্ঠে নজরুল রচিত অন্যান্য ধারার গানও সমানভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

বাংলাদেশের অনেক গুনী শিল্পীর কণ্ঠে নজরুলের গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রখ্যাত শিল্পী ফিরোজা বেগম, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, শেখ লুৎফর রহমান, ফেরদৌসী রহমান, বেদার উদ্দীন আহমেদ, সোহরাব হোসেন, সুধীন দাশ, খালিদ হোসেন, নীলুফার ইয়াসমীন বাংলাদেশে নজরুলের গান প্রচারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমানকালে শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল, লীনা তাপসী খান, শাহীন সামাদ, নাশিদ কামাল, ইয়াসমিন মুশতারী, শারমিন সাথী ইসলাম, ফেরদৌস আরা, সুমন চৌধুরী, ইয়াকুব আলী খান, সালাউদ্দীন আহমেদ, ফাতেমা তুয জোহরা, শবনম মুশতারী, সাদিয়া আফরিন মল্লিক, সুজিত মুস্তফা প্রমুখ শিল্পীদের কণ্ঠে নজরুলের নানা অঙ্গের গান শ্রোতার মন জয় করছে প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশের সংগীতাংগনে নজরুলের গান প্রচার এবং জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে গুনী এই শিল্পীদের অবদান অনস্বীকার্য।

টিকা ও তথ্যনির্দেশ

৪৭। আসাদুল হক, *নজরুল সংগীতের রূপকার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাড়ি: ৩৩০বি, রাস্তা: পুরাতন ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা, শ্রাবণ ১৩৯৭, পৃ ১৪১

৪৮। *প্রাগুক্ত:* পৃ ১৪৯

৪৯। *প্রাগুক্ত:* পৃ ১৮৬

৫০। করুনাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৌষ ১৩৮৪, পৃ ৫১

উপসংহার

বাংলার আদি সুর লোকসুর। ঐতিহ্যগতভাবেই বাংলার গান লোকসুরাশ্রয়ী। কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' অভিধায় বাঙালির কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত মানুষের অধিকারের পক্ষে তাঁর কণ্ঠ ও লেখনী সবসময় সোচ্চার ছিল সাহিত্য এবং সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় লোক ঐতিহ্য ও লোকউপাদান স্বতস্ফুর্ত ভাবে উঠে এসেছে। সমসাময়িক বাংলা সংগীতের পঞ্চরত্ন হিসেবে যারা সুপরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অতুলপ্রসাদ সেনের গানে বাউল সুরের ব্যবহার হলেও নজরুল তাঁর গানে ঝুমুর, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল এবং ঝাঁপান সুরের ব্যবহার করে লোকসংগীতের সামগ্রিক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কাজী নজরুলের বাল্যকাল, বেড়ে ওঠা এবং সংগীত জীবনের প্রারম্ভকাল অতিবাহিত হয়েছে পুরোপুরি লোকজ আবহে। ছোটবেলায় লেটোদলে যোগদান এবং সংগীতসৃষ্টির মধ্য দিয়ে লোকউপাদান সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছেন এবং শুধুমাত্র লোকসংগীত নয়, সামগ্রিক অর্থে সংগীতজগতে তাঁর প্রবেশ ঘটেছে লেটোদলের মাধ্যমেই। তিনি তাঁর রচিত সাহিত্য এবং সংগীতে মাটি ও মানুষের জয়গান করে গেছেন। নজরুল তাঁর লোকসুরের গানের বিষয়স্তুতে ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, পৌরাণিক ও ধর্মীয় কাহিনী, গ্রামীন জনসমাজের জীবনযাত্রা, কুসংস্কার প্রভৃতি লোকউপাদান ব্যবহারের পাশাপাশি আধুনিকতার সাথে আবহমান লোকসুরের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। প্রতিটি দেশের লোক ঐতিহ্যকে সেই দেশের স্ব স্ব পরিচিতি বলে গন্য করা হয়। নজরুলের লোকসুরের গান বাংলার লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে। তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন সংগীত রচয়িতার রচনার বিষয়বস্তুতে এত বৈচিত্র্য পাওয়া যায়না বলে আমার ধারণা। শুধুমাত্র লোকসুরের গান নগ, সংগীতের বিচিত্র ধারায় তাঁর রচনা 'নজরুল সংগীত' হিসেবে বিশ্বদরবারে সুপরিচিত এবং সমাদৃত। নজরুল রচিত লোকসুরের গান সঠিকভাবে চর্চা এবং উপস্থাপনের মাধ্যমে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

আমার গবেষনাকর্মের মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের লোকসুরের গানের সামগ্রিক রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়কের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, সহযোগিতা, বিভিন গ্রন্থের সহায়তা এবং আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও লেখনী দ্বারা পাঠক এবং নজরুলপ্রেমীরা বিন্দুমাত্র উপকৃত হলে এ চেষ্টা সার্থক হবে।

পরিশিষ্টঃ ১

আবদুস্ সাত্তার প্রণীত 'নজরুল সঙ্গীত অভিধান' গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা কাজী নজরুল ইসলামের লোকসংগীতানুগ গানের তালিকা এ পর্যায়ে তুলে ধরা হলঃ

১। অকুল তুফানে নাইয়া কর পার

শিল্পী- গনি মিয়া, বিষয়: ইসলাম, পল্লী সুর

২। অমন করে হাসিসনে আর

শিল্পী: কে মল্লিক, শ্রেণী: ঝুমুর

৩। অসীম আকাশ হাতরে ফিরে

শিল্পী: জ্ঞান ঘোষ, শ্রেনী: বাউল

৪। আকাশে হেলান দিয়ে

ছায়াছবি: সাপুড়ে, শিল্পী: কানন দেবী, বিষয়: লোকগীতি

৫। আজ মধুবনে চাঁদের মেলা

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: কাহারবা

৬। আজ নাচনের লেগেছে যে গাঁদি

শিল্পী: হরিদাস বন্দোপাধ্যায়, বিষয়: হাসির গান, শ্রেনী: পল্লী

৭। আমার এ না যত্রী না লয়/ আমার সাম্পান যাত্রী না লয়।

শিল্পী: বিমল দাশগুপ্ত, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি তাল: কাহারবা।

৮। আমার গহীন জলের নদী

শিল্পী: ধীরেন দাস, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি তাল: কাহারবা

৯। ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি।

শিল্পী: গোপাল চন্দ্র সেন, শ্রেনী: বাউল, তাল: লোফা

১০। আমার প্রাণের দ্বারে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: লোফা

১১। আমার ভাঙা নায়ের বৈঠা ঠেলে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা

১২। আমার মন যারে চায়

বিষয়: পল্লীসুর

১৩। আমারে ভুলিয়া বন্ধু

শ্রেনী: পল্লী সুর, তাল: দ্রুত দাদরা

১৪। আমি কুল ছেড়ে চলিলাম ভেসে

শিল্পী: মৃনাল কান্তি ঘোষ, সুরকার: গিরীন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি,

১৫। আমি ডুরি ছেঁড়া ঘুড়ির মতন

বিষয়: লোক-সঙ্গীত, শ্রেনী: বাউল, তাল: কাহারবা

১৬। আমি দেখেছি তোর শ্যামে

বিষয়: হাসির গান, শ্রেনী: বাউল, সুর: লোকজ

১৭। আমি বাউল হলাম ধুলির পথে

শিল্পী: শান্তা বসু, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল

১৮। আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল

বিষয়: পল্লীগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: লোফা

১৯। আমি ময়নামতীর শাড়ী দেবো

শিল্পী: সুধীর দত্ত, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা

২০। আমি যাবই যাব বনে

গীতি-নাট্য: শাল পিয়ালের বনে, বিষয়: লোকগীতি

২১। আয় পাষন্ড যুদ্ধ দে তুই

শিল্পী: দীলিপ কুমার মন্ডল, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: লেটোর গান, তাল: দ্রুত-দাদরা

২২। আয় রনজয়ী পাহাড়ী দল

বিষয়: পাহাড়ীদের গান

২৩। আরশীতে তোর নিজের মুখই

শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রেনী: ভাটিয়ালি

২৪। আলো আঁধারে ফুটলো যে ফুল

শ্রেনী: বাউল, তাল: দাদরা

২৫। আসিলে কে গো বিদেশী

বিষয়: লোকগীতি, তাল: লোফা

২৬। উপল নুড়ির বাঁকন চুড়ি বাজে

শিল্পী: বীনা চৌধুরী, সুরকার: শৈলেশ দত্তগুপ্ত, বিষয়: লোকগীতি

২৭। এ কুল ভাঙ্গে ও কুল গড়ে

শিল্পী: মৃনাল কান্তি ঘোষ, সুরকার: চিত্ত রায়, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা

২৮। এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: মিশ্র বাউল

২৯। এই রাঙামাটির পথে লো

শিল্পী: শ্রীমতি প্রমোদা, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

৩০। এল শোকের সেই মহররম

শিল্পী: মোঃ কাশেম, বিষয়: ইসলাম, শ্রেনী: মর্সিয়া, তাল: কাহারবা

৩১। এসো ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে বৃন্দাবন

শিল্প: কালিপদ সেন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: আঞ্চলিক ছন্দ

৩২। ঐ ঘাষের ফুলের মটরশুটির ক্ষেতে , শ্রেনী: বাউল

৩৩। ও কালো বউ জল আনিতে

শিল্পী: সুধীর দত্ত, বিষয়: লোকগীতি, রাগ: পাহাড়ী, তাল: কাহারবা

৩৪। ও কালো শশীরে আর বাজাও না

শিল্পী: শৈল দেবী, বিষয়: লোকগীতি, তাল- কাহারবা

৩৫। ও কুল ভাঙা নদী রে

শিল্পী: গোপাল সেন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা।

৩৬। ও ঝুমরো তীর ধনুক নিয়ে

গীতি-নাট্য: শাল-পিয়ালের বনে, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর গান, তাল: আঞ্চলিক ছন্দ

৩৭। ও তুই যাসনে লো রাই কিশোরী

শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দেবী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর তাল: খেমটা।

৩৮। ও দুখের বন্ধু রে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: কাহারবা

৩৯। ও বন্ধু দেখলে তোমায় বুকের মাঝে

শিল্পী: পদ্মরানী চট্টোপাধ্যায়, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা।

৪০। ও বন পথ ওরে নদী

নাটক: মধুমালা, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: হাসির গান।

৪১। ও বাঁশের বাঁশিরে

শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা।

৪২। ও গো মা ফাতেমা ছুটে আয়

শিল্পী: আব্বাস উদ্দিন আহমদ, বিষয়: ইসলামী, শ্রেনী: মর্সিয়া।

৪৩। ওগো ললিতে আমি পারিনা, বিষয়: লোকগীতি

৪৪। ওরে এ কোন সুরধুনী

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল

৪৫। ওরে ও দরিয়ার মাঝি মোরে নিয়ে

শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ, বিষয়: ইসলাম, সুর: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা।

৪৬। ওরে ও পদ্মা নদী

নাটক: মধুমালা, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি

৪৭। ওরে কে বলে আরবে নদী নাই

শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ, বিষয়: ইসলাম, শ্রেনী: লোকগীতি

৪৮। ওরে গো-রাখা রাখাল

শিল্পী: কালিপদ সেন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: নাটকের গান।

৪৯। ওরে ডেকে দে লো মহুয়া বনে

শিল্পী: শৈল দেবী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: লোকতাল।

৫০। ওরে বেভুল তবু ভাঙলো না ভুল

শিল্পী: মৃনালকান্তি ঘোষ, বিষয়: লোকগীতি

৫১। ওরে মাঝি ভাই

শিল্পী: বিমল দাশগুপ্ত, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা।

৫২। ওরে রাখাল ছেলে বল্ কি রতন

শিল্পী: মৃনালকান্তি ঘোষ, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর,

৫৩। ওরে শোন ঝুমরো শোন

গীতি-নাট্য: শাল-পিয়ালের বনে, সুর: পল্লী সুর, শ্রেনী: ঝুমুর

৫৪। ওলো ননদীনি বল

শিল্পী: কে মল্লিক, বিষয়: হাসির গান, সুর: লোকগীতি

৫৫। ওহে রাখাল রাজ! কি সাজে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: খেম্‌টা

৫৬। কত নিদ্রা যাও রে কন্যা

শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন, বিষয়: লোকগীতি

৫৭। কথা কইবে না কথা কইবো না বউ

শিল্পী: কানন দেবী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: চলচ্চিত্রের গান, ছায়াছবি: সাপুড়ে, তাল: কাহারবা।

৫৮। কন্যার পায়ের নূপুর বাজে রে

শিল্পী: মাধুরী দে, সুরকার: নিতাই ঘটক, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: দ্রুত-দাদরা

৫৯। কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: চলচ্চিত্রে লোকসুরের গান

৬০। কয়লা খাদে যাবো না

গীতি-নাট্য: শাল পিয়ালের বনে, বিষয়: লোকগীতি, তাল: দাদরা

৬১। কাজলা বিলের শাপলা

বিষয়: হাসির গান, শ্রেনী: লোক সুর

৬২। কান্ডারী গো কর কর পার

শিল্পী: মৃনালকান্তি ঘোষ, সুরকার: চিত্ত রায়, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: দাদরা।

৬৩। কার বাঁশরী বাজিল মেঠো সুরে

শিল্পী: কুমার সান্তনা সেন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল

৬৪। কালা এত ভাল কি হে

শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দেবী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: খেমটা

৬৫। কালো জল কালিতে সই

শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর (সাঁওতালী), তাল: মাদলে ব্যবহৃত ৬ মাত্রার লোকতাল

৬৬। কালো পাহাড় আলো করে কে

শিল্পী: আঙ্গুরবালা, বিষয়: লোকগীতি, তাল: দাদরা

৬৭। কালো রূপে মন ভুলালো

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: কীর্তনাঙ্গ, তাল: দাদরা

৬৮। কি জানি পইড়াছে বন্ধু মনে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি

৬৯। কি হবে লাল পাল তুলে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা

৭০। কিশোরী মিলন বাঁশরী

শিল্পী: হরিমতি, বিষয়: কাব্যগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

৭১। কুঁচ বরন কন্যা রে তার

শিল্পী: আব্বাস উদ্দীন আহমদ, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা

৭২। কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে

শিল্পী: কালিপদ সেন ও শান্তা বসু, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

৭৩। কে আজি বাউল সুরে

শিল্পী: ইন্দু সেন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল

৭৪। কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল গো

শিল্পী: আঙ্গুরবালা, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: লোকতাল (৬ মাত্রা)

৭৫। কেন বাজাও বাঁশী কালো শশী

শিল্পী: হরি বাঈজী, বিষয়: ভক্তিমূলক, শ্রেনী: লোক সুর

৭৬। কোন বিদেশের নাইয়া তুমি

শিল্পী: ফুল কুমারী ও রতন মাঝি, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি।

৭৭। কোন সুদূরের চেনা বাঁশীর

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: দাদরা

৭৮। গাছের তলে ছায়া আছে

শিল্পী: গোপাল সেন, বিষয়: লোকগীতি, তাল: কাহারবা

৭৯। গেরুয়া-রঙ মেঠো পথে

শিল্পী: গোপাল সেন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: নবতাল/দাদরা

৮০। গ্রীষ্মের শেষে মাঠের পরে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: লোফা

৮১। চাঁপা রঙের শাড়ি আমার

বিষয়: লোকগীতি, রাগ: সারং মিশ্র, তাল: কাহারবা

৮২। চিকন কালো বেদের কুমার

শিল্পী: বীনা চৌধুরী, বিষয়: লোকগীতি, তাল: দাদরা

৮৩। চুড়ির তালে নুড়ির মালা

শিল্পী: মিস প্রমোদা, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

৮৪। চোখ গেল চোখ গেল

শিল্পী: শচীন দেব বর্মন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

৮৫। ছন্নছাড়া বেদের দল

গীতিনাট্য: 'বনের বেদে', বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: আঞ্চলিক(৬ মাত্রার তাল মাদলে ব্যবহৃত।)

৮৬। ছি ছি হেরে গেলে শ্যাম

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: কীর্তন, রাগ; ভৈরবী

৮৭। জংলা মায়ের জংলী খোকা-খুকী

গীতি-নাট্য: 'শাল পিয়ালের বনে' বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: আঞ্চলিক সুর, তাল: কাহারবা

৮৮। ঝুম্ ঝুম্ ঝুমরা নাচ নেচে

শিল্পী: মৃনালকান্তি ঘোষ, সুরকার: চিত্ত রায়, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

৮৯। ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে

শিল্পী: কালিপদ সেন ও শান্তা বসু, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

৯০। কুনুর নদীর ধারে

শিল্পী: কালিপদ সেন ও শান্তা বসু,বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

৯১। ডাল মেল পাত্র মেল

শিল্পী: পারুল সেন, বিষয়: লোকগীতি

৯২। তব চরন প্রান্তে মরন বেলায়

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: কীর্তন

৯৩। তিয়াসের জল লইয়া

শিল্পী: কুন্ডুলাল সাহা, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: আঞ্চলিক

৯৪। তুমি এতোদিনে মরন টানে

নাটক: মধুমালা, বিষয়: লোকগীতি

৯৫। তুমি দুঃখের বেশে এলে বলে

সুর: লোকগীতি, বিষয়: ভক্তিমূলক, শ্রেনী: বাউল, তাল: খেমটা

৯৬। তুমি পীরিতি কি করহে শ্যাম

শিল্পী: কমলা দেবী (হাজরা), বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

৯৭। তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে

শিল্পী: মিস প্রমোদা, সুর: লোকতাল, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: সাঁওতালী, তাল: দ্রুত-দাদরা

৯৮। তেল রইল রইল হলুদ, সুর: গ্রাম্য সুর

৯৯। তোমার আসার আশায় দাড়িয়ে

শিল্পী: আভা সরকার, সুরকার: গিরীন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি

১০০। তোমার কুলে তুলে (তুইলা) বন্ধু

শিল্পী: ধীরেন দাস, শ্রেনী: ভাটিয়ালি

১০১। তোর রূপে সই গাহন করে

শিল্পী: রঞ্জিত মন্ডল, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা

১০২। তোরে খাইবার দিব জানি কচি ঘাস

বিষয়: হাসির গান, সুর: লোকগীতি

১০৩। দরিয়ায় ঘোর তুফান (পার কর নাইয়া)

শিল্পী: তকরীম উদ্দীন আহম্মদ, বিষয়: ইসলামী, সুর: জংলা, তাল: দাদরা

১০৪। দুধে আলতায় রঙ যেন তার

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কার্হাবা

১০৫। দুরের বন্ধু আছে আমার

শিল্পী: সুজন মাঝি, বিষয়: লোকগীতি

১০৬। নদী এই মিনতি তোমার কাছে

শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কার্হাবা

১০৭। নদীর নাম সই অঞ্জনা

শিল্পী: আব্বাস উদ্দীন আহমদ, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাওয়াইয়া, তাল: কাহারবা

১০৮। ননদী হার মেনেছি তোর সনে

বিষয়: লোকগীতি, তাল: ত্রিতাল

১০৯। নন্দ দুলাল নাচে নাচে রে

শিল্পী: মৃনালকান্তি ঘোষ, বিষয়: ভক্তিমূলক, শ্রেনী: ঝুমুর

১১০। নাইতে এসে ভাটির স্রোতে

শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা

১১১। নাচের নেশার ঘোর লেগেছে

শিল্পী: আঙ্গুরবালা, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর (সাঁওতালী), তাল: দাদরা (মাদলের ঝোঁক)

১১২। নিম ফুলের মউ পিয়ে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: আঞ্চলিক লোকগীতি

১১৩। নিরুদ্দেশের পথে যেদিন প্রথম

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: খেম্‌টা

১১৪। নিশির নিশুতি যেন

শিল্পী: পদ্মরানী চট্টোপাধ্যায়, সুরকার: গিরীন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি, তাল: দ্রুত-দাদরা

১১৫। নিশি পবন! নিশি পবন! ফুলের দেশে যাও

শিল্পী: মৃনালকান্তি ঘোষ, সুরকার: গিরীন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি, তার: দ্রুত-দাদরা

১১৬। নিশি ভোরের বেলা কাহার

গীতি-আলেখ্য: 'বনের বেদে', বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: কাহারবা

১১৭। পউষ এল গো

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: লোফা

১১৮। পথ ভোলা কোন রাখাল ছেলে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: লোফা

১১৯। পথে পথে কে বাজিয়ে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: লোফা

১২০। পদ্ম দীঘির ধারে ধারে ঐ

শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ,বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাওয়াইয়া, তাল: দাদরা

১২১। পদ্মার ঢেউ রে

শিল্পী: শচীন দেব বর্মন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: দ্রুত-দাদরা

১২২। পর হবে তোর আপন জনে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল

১২৩। পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম

বিষয়: লোকগীতি, ছায়াছবি: সাপুড়ে, বিষয়: লোকগীতি

১২৪। পুরান হাওয়া পশ্চিমে যাও

শিল্পী: বেদার উদ্দীন আহমদ, বিষয়: ইসলামী, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা

১২৫। প্রাণ বন্ধুরে তোমার জন্য, বিষয়: লোকগীতি

১২৬। বন বিহঙ্গ যাও রে উড়ে

শিল্পী: মৃনালকান্তি ঘোষ, সুরকার: গিরীন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি, তাল: কাহারবা

১২৭। বনের হরিন আয় রে

শিল্পী: পারুল সেন, বিষয়: লোকগীতি, তাল: দাদরা

১২৮। বন্ধু আজো মনে রে পড়ে

শিল্পী: আব্বাস উদ্দীন আহমদ, সুরকার: গিরীন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি

১২৯। বন্ধু দেখলে তোমায় বুকের মাঝে

শিল্পী: পদ্মরানী, সুরকার। গিরীন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি

১৩০। বল সই বসে কেন একা

শিল্পী: মন্টু রানী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর (সাঁওতালী)

১৩১। বাঁকা ছুরির মতন বেঁকে উঠল, বিষয়: লোকগীতি

১৩২। বাজলো শ্যামের বাঁশী বিপিনে, বিষয়: লোকগীতি

১৩৩। বাঁশী কে বাজায় বনে

শিল্পী: মন্টু রানী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

১৩৪। বাঁশী বাজায় কে কদম তলায়

শিল্পী: মৃনালকান্তি ঘোষ, সুরকার, গিরীন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: দাদরা

১৩৫। বিজন গোঠে কে রাখাল

শিল্পী: ধীরেন দাস, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: কাহারবা

১৩৬। বুঝলাম নাথ এতোদিনে

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: লেটোর গান

১৩৭। বেদিয়া বেদেনী ছুটে আয়

শিল্পী: সীতা দেবী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বেদের গান, তাল: কাহারবা

১৩৮। বেলা শেষের উদাস হওয়া

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: কাহারবা

১৩৯। বৈঁচি মালা রইল গাঁথা

শিল্পী: মাধুরী দে, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর, তাল: লোকতাল

১৪০। ভবের এই পাশা খেলায়

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: লোফা

১৪১। ভালবেসে অবশেষে কেঁদে দিন

বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: কাহারবা

১৪২। মন রে মায়া জগতের মূল মায়া

শ্রেনী: ইসলামী (পল্লী সুর), তাল: কাহারবা

১৪৩। মনে যে মোর মনের ঠাকুর

শিল্পী: কে মল্লিক, শ্রেনী: বাউল

১৪৪। মা এসেছে মা এসেছে উঠল কলরোল

শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত ও বাংলার ছেলে মেয়ে, বিষয়: বিচিত্রা, শ্রেনী: আগমনী, সুর: বাউল/ভাটিয়ালি

১৪৫। মা গো তোর গুষ্ঠির পায়ে

বিষয়: হাসির গান, শ্রেনী: বাউল

১৪৬। মেঘ বরন কন্যা থাকে

শিল্পী: মৃনালকান্তি ঘোষ, সুরকার: চিত্ত রায়, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি

১৪৭। মেঘলা নিশি ভোরে মন যে

শিল্পী: শচীন দেব বর্মন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

১৪৮। মোর লীলাময় লীলা করে

সুরকার: নিতাই ঘটক, শিল্পী: মৃনালকান্তি ঘোষ, বিষয়: ভক্তিমূলক, শ্রেনী: বাউল

১৪৯। হাসে নাচে নায়

গীতি-আলেখ্য: 'বনের বেদে', বিষয়: লোকগীতি

১৫০। রাজার দুলাল রাজপুত্র গো, বিষয়: লোকগীতি

১৫১। শিবা হয়ে পরাজিতে পশুরাজে

নাটিকা: "শকুনী বধ", বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: লেটো

১৫২। শোন দেখি মন, বিষয়: লোকগীতি

১৫৩। সই পলাশ বনে রঙ ছড়াল

শিল্পী: পারুল সেন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

১৫৪। সখি নাম ধরে কে ডাকে

শিল্পী: পারুল সেন, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর

১৫৫। সন্ধ্যা হল ঘরকে চল ও ভাই

শিল্পী: গনেন চক্রবর্তী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ভাটিয়ালি

১৫৬। সাগর আমায় ডাক দিয়েছে

শ্রেনী: বাউল, রাগ: বিভাস, তাল: দাদরা

১৫৭। সাত ভাই চম্পা জাগো রে

শ্রেনী: ভাটিয়ালি

১৫৮। সাপুড়িয়া রে বাজাও বাজাও

শিল্পী: সীতা দেবী, বিষয়: লোকগীতি, তাল: কাহারবা

১৫৯। সাপের মনি বুকে করে

শিল্পী: আঙ্গুরবালা, বিষয়: লোকগীতি, তাল: কাহারবা

১৬০। সোনার আলোর কেউ খেলে যায়

সুরকার: চিত্ত রায়, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: বাউল, তাল: কাহারবা

১৬১। হলুদ গাঁদার ফুল

শিল্পী: বিজয় গোস্বামী, বিষয়: লোকগীতি, শ্রেনী: ঝুমুর (সাঁওতালী), তাল: লোকজ ছন্দ

পরিশিষ্ট-২

কতিপয় গানের স্বরলিপি সংযোজন

(১)

বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয়, আয়, আয়
ধা তিনা ধা তিনা তিনা ঢোলক মাদল বাজে
বাঁশীতে পরান মাতায় ॥

দলে দলে নেচে নেচে আয় চ'লে
আকাশের সামিয়ানা-তলে
বর্শা তীর ধনুক ফেলে আয়রে
হাড়ের নূপুর প'রে পায় ॥

বাঘছাল প'রে আয় হৃদয়-বনের শিকারী
ঘাগরা প'রে, প'রে পলার মালা
আয় বেদের নারী।
মহুয়ার মৌ পিয়ে ধুতুরা ফুলের পিয়ালায় ॥

H.M.V. N 9960 ॥ শিল্পী ঃ সীতা দেবী ॥ তালঃ কাহারবা

II {সা জ্ঞা মা দা । পা মা জ্ঞা সা I সা -না (ন)সা -না । সা -া -া -া} I
বে দি য়া বে দি নী ছু টে আ য় আ য় আ য় ০ ০

I {মা দা পা পা । দা পা দা পা I (প)মা মা -া সা । (স)মা -া মা মা} I
ধা তি না ধা তি না তি না ঢো ল ক্ মা দ ল্ বা জে

I -া জ্ঞা রা জ্ঞা । (জ্ঞ)দা পা (প)ণা (প)মা I মা -া -া -া । -া জ্ঞা রা জ্ঞা I
০ বাঁ শী তে প রা ন মা তা ০ ০ য় ০ বাঁ শী তে

I দা পা ণা (প)মা । মা -া -া -া I (গ)মা -গা মা -গা । মা -া -া -া II
প রা ন মা তা ০ ০ য় আ য় আ য় আ ০ ০ য়

৭৮

উৎস-১: *নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি (তৃতীয় খন্ড)*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, অগ্রহায়ন, ১৩৯৫, পৃ ৭৮-৭৯

(২)

ও, কূল-ভাঙ্গা নদী রে,
আমার চোখের নীর এনেছি
মিশাতে তোর নীরে ॥

সে লোনাজলের সিন্ধুতে নদী,
নিতি তব আনাগোনা
মোর চোখের জল লাগবে না ভাই
তার চেয়ে বেশী লোনা।
আমায় কাঁদতে দেখে আস্‌বিনে তুই রে,
উজান বেয়ে ফিরে' নদী,
উজান বেয়ে ফিরে' ॥

আমার মন বোঝে না, নদী—
তাই বারে বারে আসি ফিরে
তোর কাছে নিরবধি
আমার মন বোঝে না, নদী।
তোরই অতল তলে ডুবিতে চাই রে,
তুই ঠেলে দিস্ তীরে (ওরে) ॥

H.M.V.N 7261 ॥ শিল্পী ঃ গোপালচন্দ্র সেন (অন্ধ-গায়ক) ॥ সুর ঃ কাজী নজরুল ॥ তাল ঃ কাহার্‌বা

গা -মা II পা -না -া না । না -া র্সা -র্রা I র্রা -র্গর্রা র্গর্রা -র্সা । -া -া -া -া I
ও ০ কূ ০ ল্ ভা ঙা ০ ন ০ দী ০০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া । -া র্স-া -া -পা I -া -া না না । -া র্সা র্সা -র্রর্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র্ চো খে ০০

I -না না -া র্রর্সা । র্সা -না ধনা -া I -া -া -া -া । -া -া -না -র্সা I
র্ নী র্ এ নে ০ ছি০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -না -র্সা -না -ধা । -পা -া -মপাঃ -মঃ I -গা -া -া -া । -া -া [গ]-া -মা I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -না না -র্সা । না -ধা ধা -পা I পা -ধা পধা -া । -া -া -া -া I

মে ০ শা ০ তে ০ তো র্ নী ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া । -পা -না -ধা -া I -মপাঃ -মঃ -গা -া । -া -া গা -মা II

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ "ও ০"

II {-া সা রা মা । মা -া মা -া I মা -পা পা পা । পা -া মপা -া I

০ সে লো না জ ০ লে র্ সি ন্ ধু তে ন ০ দী০ ০

I -া -া -া -া । -া -া -া -া I -মপাঃ -মঃ -গা -া । -া -া -া -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা মা -পা পা । [প]মা -া মা মা I মা -পমা গা -া । -া -া -মা -পা I

নি তি ০ ত ব ০ আ না গো ০০ না ০ ০ ০ ০ ০

I -মপা -মা -গা -া । -া -া -া -া I সা রা -মা মা । মা -া মা [স]-া I

০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সে লো ০ না জ ০ লে র্

I মা -পা পা পা । পা -া মা -পা I -মগা -া -া -া । -া -া -া -া I

সি ন্ ধু তে ন ০ দী ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা -া [প]ণা । [ণ]ধা -পা মা মা I মা -পমা গা -া । -া -া -া -া} I

নি তি ০ ত ব ০ আ না গো ০০ না ০ ০ ০ ০ ০

I পা -না -া ^নর্সা । র্সা -া র্সর্রা -র্সনা I -া না -া নর্রা । র্সা -া র্সা -র্সর্রা I
মো ০ র্ চো খে র্ জ্ঞ০ ০ল্ ০ লা গ্ বে০ না ০ ভা ০০

I -র্রর্গাঃ -র্রাঃ -র্সা -া । -া -া -র্সাঃ -নঃ I -া -া -নর্সা -না । -ধনা -ধা -পমা -গা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ই

I পা -না না র্সা । নাঃ -ধঃ ধা -না I ^ধপা -া পা -া । -া -া -া -া I
তা র্ চে য়ে বে ০ শী ০ লো ০ না ০ ০ ০ ০ ০

I পা -না -া ^নর্সা । র্সা -া র্সর্রা -র্সনা I -া না -া নর্রা । র্সা -া র্সা -র্সর্রর্সা I
মো ০ র্ চো খে র্ জ্ঞ০ ০ল্ ০ লা গ্ বে০ না ০ ভা ০০০

I -না -া -া -র্সনা । ^ন-ধাঃ ঃ -পা -া I পা -না না র্সা । না -ধা ধা -না I
০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ই তা র্ চে য়ে বে ০ শী ০

I পধা -া পা -া । -া -া ^পর্সা র্সা I র্সা -া -র্সর্রা র্রা । র্রা -া র্রা -র্সা I
লো০ ০ না ০ ০ ০ আ মায় কাঁ ০ ০দ্ তে দে ০ খে ০

I র্সা -র্রা র্রা -র্মা । র্গা -র্রা র্রা -র্গা I র্সর্রা -া -া- -া । -া -া -া -া I
আ স্ বি ০ নে ০ তু ই রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -র্সর্রা -র্গর্মা -র্গা -র্রা । -র্সা -া -া -া I না -র্সা র্সা -া । র্সা -া না -র্সা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ উ ০ জা ন্ বে ০ য়ে ০

I ধা -না ধপা -া । -না -া না না I ^প-া না -র্সা র্সা । র্সা -া না -র্সা I
ফি ০ রে০ ০ ০ ০ ন দী ০ উ ০ জান্ বে ০ য়ে ০

I ধা -না ধপা -া । -া -া -মা -পা I -মগা -া -া -া । -া -া গা -মা II
ফি ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "ও ০"

II -া -া -া -া । -া -া গা গা I -মা -পা গমা গা । রাঃ -সঃ সা -রা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা ০ ই্ মন্ বো ঝে ০ না ০

I ণ্সা সণ্া -সা -া । -া -া সা -া I -া রা -মা মা । মা -া মা -া I
ন০ দী০ ০ ০ ০ ০ তা ই ০ বা ০ রে বা ০ রে ০

I মা -পা পা -ধা । মপা -া মগা -া I -া গা -পা গা । পধা -না ধপা পা I
আ ০ সি ০ ফি০ ০ রে০ ০ ০ তো র্ কা ছে০ ০ নি০ র

I পধা -পধনা ধপা -া । -া -া গা মাঃ I -পঃ -া -গমা গা । রাঃ -সঃ সা -রা I
ব০ ০০০ ধি০ ০ ০ ০ আ মা ০ র্ মন্ বো ঝে ০ না ০

I ণ্সা -সণ্া -সা -া । -া -া র্সা র্সা I র্সা -র্রা র্রা -া । (র্স)র্রা -া র্রা -র্সা I
ন০ দী০ ০ ০ ০ ০ তো রি অ ০ ত ল্ ত ০ লে ০

I র্সা -র্রর্গর্মা র্মা -র্গা । র্গা -র্রা র্রা -র্গা I র্সর্রা -া -া -া । -া -া -া -া I
ডু ০০০ বি ০ তে ০ চা ই রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -র্সরা -র্গর্মা (র্ম)-র্গা -র্রা । -র্সা -া -া (প)-া I র্সা -র্রা র্রা -া । (র্স)র্রা -া র্রা -র্সা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ০ ত ল্ ত ০ লে ০

I র্সা -া র্রা -র্মা । র্গর্রা -া র্রা -র্গা I র্সর্রা -া -র্সা -া । -া -া -া (প)-া I
ডু ০ বি ০ তে০ ০ চা ই রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৫৮

উৎস-২: নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি (চতুর্থ খন্ড), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, মাঘ, ১৩৯৬, পৃ ৫৪-৫৮

(৩)

হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল ॥

কুসুমী-রঙ শাড়ি, চুড়ি বেলোয়ারি
কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে
বাবলা ফুল, আমের মুকুল
নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল ॥

তিরকুট পাহাড়ে শাল-বনের ধারে
বসবে মেলা আজি বিকাল বেলায়,
দলে দলে পথে চলে সকাল হতে
বেদে-বেদিনী নূপুর বেঁধে পায়
যেতে দে ওই পথে বাঁশী শুনে' শুনে' পরান বাউল
নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল ॥

গলার মালা নাই
কী যে করি ছাই,
খুঁজে এনে দে এনে দে রে সিঁয়া-কূল
নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল ॥

New Theatres Record H. 11779 ॥ নিউ থিয়েটার্স সমবেত-সঙ্গীত ॥ 'সাপুড়ে' ফিল্মের গান

তাল ঃ দ্রুত-দাদ্‌রা

II	{রা	-া	মা	।	-া	রা	-া	I	মা	-া	-পা	।	ধা	-া	-া	I
	হ	০	লু		দ্	গাঁ	০		দা	০	র্		ফু	০	ল্	
I	রা	-া	মা	।	-া	রা	-া	I	মা	-া	-পা	।	ধা	-া	-া	I
	রা	০	ঙা		০	প	০		লা	০	শ্		ফু	০	ল্	

I ধা -া ধণা । -ধা পা -মা I মা -পা পধা । -পা মা -গা I
এ ০ নে০ ০ দে ০ এ ০ নে০ ০ দে ০

I গা -মা -গা । রসা -ণ্‌ধা -া I ধ্‌া -সা -া । -া সা -রা I
ন ই ০ লে০ ০০ ০ রাঁ ধ্‌ বো ০ না ০

I গা -মা গা । -রা রা -া I র্সা -া -া । -া -া -া } II
বাঁ ধ্‌ বো ০ না ০ চু ০ ০ ০ ০ ল্‌

II পা -া পা । -া পা -া I ধা -া -া । পা -া -া I
কু স্‌ মী ০ র ভ্‌ শা ০ ০ ড়ী ০ ০

I গা গা -পা । পা পা -া I ধা -া -া । পা -া -া I
চু ড়ি ০ বে লো ০ য়া ০ ০ রী ০ ০

I পা -ধা ধা । -র্সা র্সা -র্রা I র্সণা -া -া । ধা ধপা -া I
কি ০ নে ০ দে ০ হ্যা০ ০ ট্‌ থে কে০ ০

I পা -ধা পা । -মা মা -া I গা -মা গা । -রা সা -রা I
বা র্‌ লা ০ ফু ল্‌ আ ০ মে র্‌ মু ০

I রা -মা -া । -া -া -া I গা -মা -গা । রসা ণ্‌ধা -া I
কু ০ ০ ০ ০ ল্‌ ন ০ ই লে০ ০০ ০

I ধ্‌া -সা সা । -া সা -া I সা রা -রা । -মা জ্ঞা -া I
রাঁ ধ্‌ বো ০ না ০ বাঁ ধ্‌ বো ০ না ০

I রা -া -া । -া -া -া I সা -রা -সা । ণধা -পা -া I
চু ০ ০ ০ ০ ল্ ন ০ ই লে০ ০ ০

I ধা -সা সা । -া সা -া I সা -রা রমা । -জ্ঞা রজ্ঞা -া I
রাঁ ধ্ বো ০ না ০ বাঁ ধ্ বো০ ০ না০ ০

I রসা -া -া । -া -া প-া II
চু০ ০ ০ ০ ০ ল্

II { পা -ধা ধা । -র্সা র্সা -া I র্সা -া -া । র্সা -া -া I
তি র্ কৃ ট্ পা ০ হা ০ ০ ড়ে ০ ০

I র্সা -র্রা র্রা । -র্গা র্রা -া I র্রসা -া -া । র্সা -া -া I
শা ল্ ব ০ নে র্ ধা ০ ০ রে ০ ০

I (-া -া -া । -া -া -র্রসা I -ধা -ণা -ধা । -পা -া -া)} I
০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্সর্রা । -র্রা র্রা -া I -র্রা -া র্রা । -জ্ঞা র্রা -জ্ঞা I
ব স্ বে০ ০ মে ০ লা ০ আ ০ জি ০

I র্রা -র্সা -র্সা । -ধা ধা -পা I ধপা -ক্ষপা -া । -া -া -া I
বি ০ কা ল্ বে ০ লা০ ০০ ০ ০ ০ য়্

I গা -পা গা । -পা পা -া I গা -া -পা । পা পা -া I
দ ০ লে ০ দ ০ লে ০ ০ প থে ০

I পা -ধা ধা । -1 ধা -1 I ধা -1 -ণা । ধা পা -1 I

চ ০ লে ০ স ০ কা ০ ল্ হ্ তে ০

I পা -ধা ধা । -র্সা র্সা -1 I র্সণা -1 ণা । -1 ধপা -1 I

বে ০ দে ০ বে ০ দি০ ০ নী ০ নূ০ ০

I পধা -পা -1 । মগা -মা -1 I পা -1 -1 । -1 -1 -1 I

পূ০ ০ র্ বেঁ০ ধে ০ পা ০ ০ ০ ০ য়্

I [প]না -1 না । -1 না ধা I না -র্সা -1 । র্সা র্সা [প]-1 I

যে ০ তে ০ দে ০ ও ই ০ প থে ০

I পা -ধা ধা । -র্সা র্সা -র্রা I র্সণা -1 ধা । -পা পা -1 I

বাঁ ০ শী ০ শু ০ নে০ ০ শু ০ নে ০

I মা -1 মা । -গা সা -রা I রা -মা -1 । -1 -1 -1 I

প ০ রা ন বা ০ উ ০ ০ ০ ০ ল্

I গা -মা -গা । রসা -ণ্ধ্া -1 I ধ্া -সা সা । -1 সা -রা I

ন ০ ই লে০ ০০ ০ বাঁ ধ্ বো ০ না ০

I গা -মা গা । -রা রা -1 I [র]সা -1 -1 । -1 -1 [প]-1 II

বাঁ ধ্ বো ০ না ০ চু ০ ০ ০ ০ ল্

II [ণ]র্সা -র্রা র্সা । -ণা ধা -ণা I র্সা -1 -না । র্সা -1 -1 I

প ০ লা র্ মা ০ লা ০ ০ না ০ ই

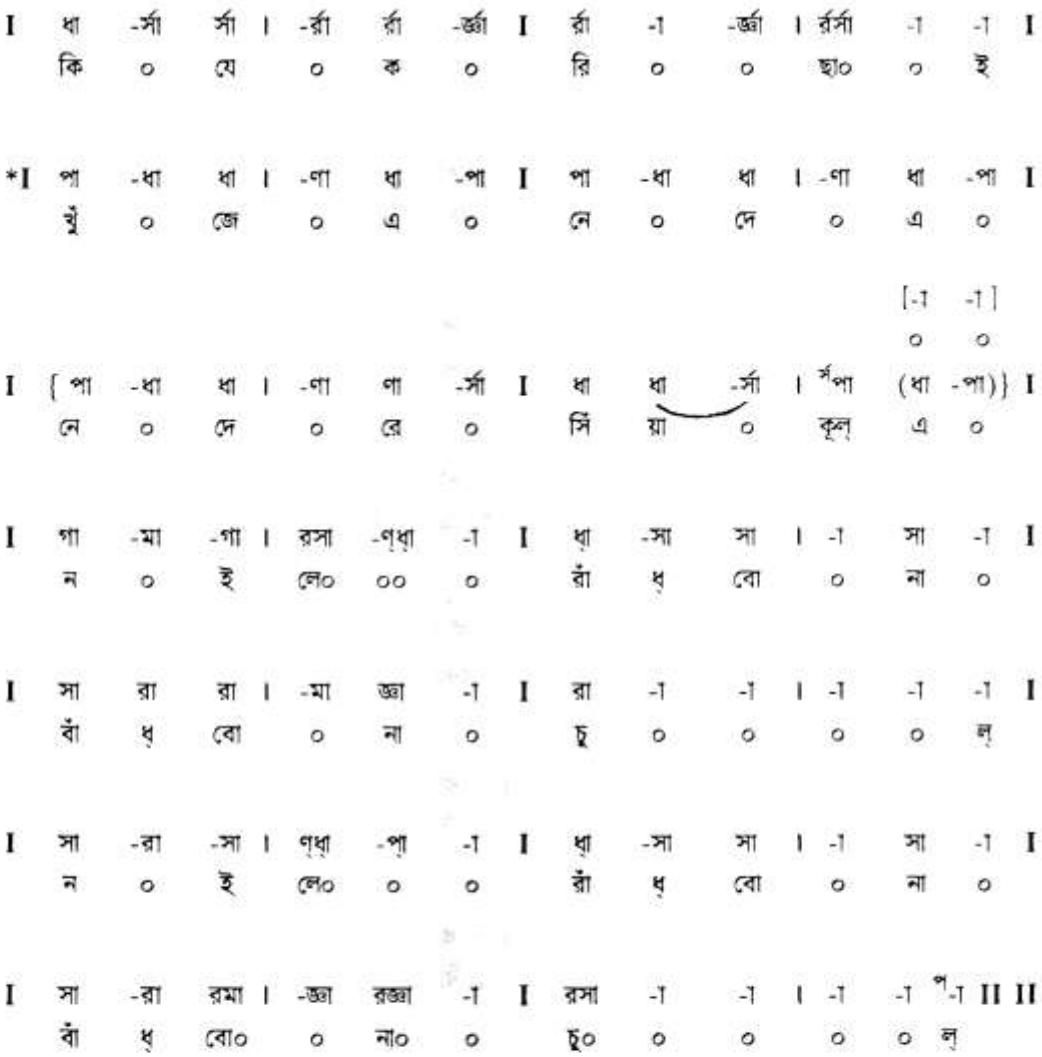

* 'খুঁজে এনে দে . . . . . সিঁয়া কূল' এই লাইনটি সমবেতভাবে আবৃত্তির ঢঙে বলা হয়েছে।

উৎস- ৩: *নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি* (চতুর্থ খন্ড), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, মাঘ, ১৩৯৬, পৃ. ১২০-১২৪

(৪)

৮

কুঁচবরণ কন্যারে তার
মেঘ-বরণ কেশ।
ওরে আমায় নিয়ে যাওরে নদী
সেই সে কন্যার দেশ রে ॥

পরনে তার মেঘ-ডম্বুর
উদয়-তারার শাড়ি
ওরে রূপ নিয়ে তার চাঁদ-সুরুজে
করে কাড়াকাড়ি রে
আমি তারি লাগি রে
আমি তারি লাগি বিবাগী ভাই
আমার চির-পথিক বেশ ॥

পিছলে পড়ে চাঁদের কিরণ
নিটোল তারি গায়ে
ওরে সন্ধ্যা-সকাল আসে তারি'
আল্‌তা হতে পায়ে রে।

ওসে রয় না ঘরে রে
ও সে রয়না ঘরে ঘুরে' বেড়ায়
ময়নামতির চরে
তা'রে দেখলে মরা বেঁচে ওঠে
জ্যান্ত মানুষ মরে রে
ওসে জল-তরঙ্গে বাজে রে তার
সোনার চুড়ির রেশ ॥

টুইন এফ.টি. ২২২৭ ॥ শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ ॥ ভাটিয়ালী ॥ তাল : কাহার্‌বা

II	পসা	-া	-া	-া	|	সা	-া	রা	-া	I	গা	-া	গমা	-গা	|	-া	রা	সা	-া	I
	কুঁ	০	০	চ্		ব	০	র	ণ্		ক	ন্	ন্যা০	০		০	রে	তা	র্	

৫৬

I -া -া সা রা | -া গা গা -মা I রা গা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ মে ঘ ০ ব র ণ্ কে ০ ০ ০ ০ শ্ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া ঁমা মা I মা -পা পা -া | পা -া পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে আ ০ মা য়্ নি ০ য়ে ০

I মা -পা -া পা | ধা -া ঁণা -পা I -া -া পধা ধা | -া পা পা ধা I
যা ০ ও রে ন ০ দী ০ ০ ০ সেই সে ০ কন্ ন্যা র্

I মা -ধা -পা -মা | গা -া -া -া I গমা -া -া -া | মা -া মপা -া I
দে ০ ০ শ্ রে ০ ০ ০ কুঁ০ ০ ০ চ্ ব ০ র০ ণ্

I গা -মা -গা -া | রা -া -সরা -া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ক ০ ০ ন্ ন্যা ০ ০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II ঁসা -া সা -া | সা -া রা -া I গা -া গমা -া | গা -রা সা -া I
প ০ র ০ নে ০ তা র্ মে ০ ঘ০ ০ ড ম্ বু র্

I -া -া সা রা | -া গা গা -মা I রা -গা গা -া | -া -া -া -া I
০ ০ উ দ য়্ তা রা র্ শা ০ ড়ি ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া গা গা I{ মা -পা -া পা | পা -া পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে রু ০ প্ নি য়ে ০ তা র্

I মা -পা -া পা | ধা -া ধণা -া I পা -ধা ধা -ণা | পা -ধা পা -মা I
চাঁ ০ দ্ সু রু ০ জে০ ০ ক ০ রে ০ কা ০ ড়া ০

I মা -ধা পা -মা | গা -া (গা মা) }I গা মা I পা -র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সর্রা -র্সা I
কা ০ ড়ি ০ রে ০ ও রে আ মি তা ০ রি ০ লা ০ গি০ ০

I না -া -া -া | -া -া -া -নর্সা I -না -া -া -া | -া -া -া -র্সা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -নধা -পা -া -া | -া -া -ধা -ণা I -পধা -পা -া -া | -া -া পা ধা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

I ধা -র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা -না I না -া না -ধা | ধা -পা পা -া I
তা ০ রি ০ লা ০ গি ০ বি ০ বা ০ গী ০ ভা ই

I -া -া -া -া | -া -া পা পা I পা -ধা ধা -ণা | ধপা -া পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মার্ চি ০ র ০ প০ ০ থি ক্

I মা -ধা -পা -মা | -গা -া -া -া I গমা -া -া -া | মা -া মপা -া I
বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ শ্ কুঁ০ ০ ০ চ্ ব ০ র০ ণ্

I গা -মা -গা -া | রা -া -সরা -া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ক ০ ০ ন্ ন্যা ০ ০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II ধ্া -সা সা -া | সা -া সা -রা I গা -া গা -মা | গা -রা সা -া I
পি ছ্ লে ০ প ০ ড়ে ০ চাঁ দে র্ ০ কি ০ র ণ্

I -া -া সা রা | -া গা গা -মা I রা -গা গা -া | -া -া -া -া I
০ ০ নি টো ল্ তা রি ০ গা ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া মা গা I মা -পা পা -া | পা -া পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে স ন্ ধ্যা ০ স ০ কা ল্

I মা -পা পা -া | ধা -া ধা -ণা I পা -ধা -া[ণ] ধা | পা -া পা -া I
আ ০ সে ০ তা ০ রি ০ আ ল্ ০ তা হো ০ তে ০

I মা -ধা পা -মা | গা -া গা মা I মা -পা পা -া[ঁ] | -া -া পা ধা I
পা ০ য়ে ০ রে ০ ও রে স ন্ ধ্যা ০ ০ ০ স কাল্

I মা -পা পা -া | ধা -া ধা -ণা I পধা -া -া [ণ]ধা | পা -া পা -া I
আ ০ সে ০ তা ০ রি ০ আ০ ল্ ০ তা হো ০ তে ০

I মা -ধা পা -মা | গা -া গা মা I পা -র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সর্রা -র্সা I
পা ০ য়ে ০ রে ০ ও সে র য়্ ০ না ঘ ০ রে ০

I না -া -া -া | -া -া -া -নর্সা I -না -া -া -া | -া -া -া -র্সা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -নধা -পা -া -া | -া -া -ধা -ণা I -পধা -পা -া -া | -া -া পা ধা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ও সে

I ধা -র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা -না I না -া না -ধা | ধা -পা পধা -পা I
র য়্ না ০ ঘ ০ রে ০ ঘু ০ রে ০ বে ০ ড়া০ য়্

I -া -া না নর্সা | -না ধা পা -ধা I পধা -া পা -া | -া -া -া -া I
০ ০ ময়্ না০ ০ ম তী র্ চ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া পা পা I পা -ধা ধা -া | ধা -া ধা -পা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ তা রে দে খ্ লে ০ ম ০ রা ০

I পা -া পা -ধা | পা -া পা -মা I গা -পা -া ধা | পা -া পা -ধা I
বেঁ ০ চে ০ ও ০ ঠে ০ জ্যা ০ ন্ ত মা ০ মু ষ্

I মা -ধা পা -মা | গা -া গা মা I মা -ধা ধা -পা[ম] | -া -া ধা ধা I
ম ০ রে ০ রে ০ তা রে দে খ্ লে ০ ০ ০ ম রা

I পা -া পা -ধা | পা -া পা -মা I মা -া -া ধা | পা -ধা পা -মা I
বেঁ ০ চে ০ ও ০ ঠে ০ জ্যা ন্ ০ ত মা ০ নু ষ্

I মা -ধা পা -মা | গা -া গা মা I পা -ধা -া ধা | ধা -া ধা -পা I
ম ০ রে ০ রে ০ ও সে জ ল্ ০ ত রঙ্ ০ গে ০

I পা -া পা -ধা | পা -া পা -মা I মা -া মা -ধা | পা -ধা পা -ধা I
বা ০ জে ০ রে ০ তা র্ সো ০ না র্ চু ০ ড়ি র্

I মা -ধা -পা -মা | -গা -া -া -া I গমা -া -া -া | মা -া মপা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ শ্ কুঁ০ ০ ০ চ্ ব ০ র০ ণ্

I গা -মা -গা -া | রা -া -সরা -া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II II
ক ০ ০ ন্ ন্যা ০ ০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

* গানটি ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালী সুরের সংমিশ্রণে গীত। সুতরাং গানটি উক্ত দু'টি সুরের 'ঢং'য়ে পরিবেশন করা বাঞ্ছনীয়।

৬০

উৎস-৪: *নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি* (প্রথম খন্ড), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, চৈত্র, ১৩৯২, পৃ ৫৬-৬০

(৫)

বাঁশী বাজায় কে কদম তলায়
ওলো ললিতে
শুনে সরে না পা পথ চলিতে ॥

তার বাঁশীর ধ্বনি যেন ঝুরে' ঝুরে'
আমারে খোঁজে লো ভুবন ঘুরে'
তার মনের বেদন শত সুরে সুরে
(ওযে) কি যেন চাহে মোরে বলিতে ॥

আছে গোকুল নগর আরো কত নারী
কত রূপবতী বৃন্দাবন-কুমারী
আছে গোকুল নগরে।

কেন আমারি নাম লয়ে বংশীধারী
আসে নিতি নিতি মোরে ছলিতে।
সখী নির্মল কূলে মোর কৃষ্ণ-কালি
কেন লাগালে কালিয়া বনমালী
আমার বুকে দিল তুষের আগুন জ্বালি'
আরো কত জনম যাবে জ্বলিতে ॥

এইচ.এম.ভি. এন. ৯৯৬৩ ॥ শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ ॥ ভাটিয়ালি ॥ তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ধপা	-া	ধা	র্সা	-া	র্রা	-র্গা	র্রর্গা	-া	-া	-া	-া	-া	(র্গ)-র্মা	(র্ম)-র্গা	-র্রা	-র্সা
বাঁ০	০	শী	বা	০	জা	য়	কে০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

-া	-া	-া	-া	(নস)-না	(ধন)-ধা	(পধ)-পা	(মপ)-মা	গা	-া	-া	-া	-া	-া
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

৫০

সা সা -রা II {রা -া -পা | পা -া -ধা I পধপা -া -মা | -া -া -া I
বাঁ শী ০ বা ০ ০ জা ০ য়্ কে০০ ০ ০ ০ ০ ০

I -মা -া -া | -পা -মা -া I গমগা -া রা | -া সা -ণা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ক০০ ০ দ ম্ ত ০

I ধ্া -া -া | -া -া -া I সা সা -রা | গমগা -া ঋসা I
লা ০ ০ ০ ০ য়্ ও লো ০ ল০০ ০ লি

[-া -া -া]
০ ০ ০

I ঽরা -সা -া | (সা সা -রা) I -া -া -া | সা সা -া I
তে ০ ০ বাঁ শি ০ ০ ০ ০ ও নে ০

I {রা -মা রা | -মা মা -পা I পধা -া -া | -া -া -া I
স ০ রে ০ না ০ পা০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -র্সণা -ধপা -া I (পা পা -ণা | ণধা পমা -া I
০ ০ ০ ০০ ০০ ০ প থ ০ চ০ লি ০

I মপা -া ঽ-া | সা সা -া)} I পা পা -ণা | ণধা ধপা -া I
তে ০ ০ ও নে ০ প থ ০ চ০ লি ০

I ঋপা -া -া | -পা -মা -া I গমা -গা রা | -া সা -ণ্া I
তে ০ ০ ০ ০ ০ ক০ ০ দ ম্ ত ০

ধ্া -া -া | -া -া -া I সা সা -রা | গমগা -া ঋসা I
লা ০ ০ ০ ০ য়্ ও লো ০ ল০০ ০ লি

I ^র্রা -সা -া । সা সা -রা II
তে ০ ০ "বাঁ শি ০"

পা -ধা -া II ধা -র্সা র্সা । -া র্সা -া I নর্সা -া -পা । পা ধা -া I
তা ০ র্ বাঁ ০ শী র্ ধ্ব ০ নি০ ০ ০ যে ন ০

I ধা -া -র্রা । র্রা র্গা -র্রা I র্সা -া -া । -া -া -া I
ঝু ০ ০ রে ঝু ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্সর্রা । -া র্রা -া I র্রা -া র্রা । -া র্গর্রা -র্সা I
আ ০ মা০ ০ রে ০ খোঁ ০ জে ০ লো০ ০

I র্সা -র্রা র্গা । -র্মা র্গা -র্রা I র্গর্রা -া -র্সা । -া -া -া I
ভু ০ ব ন্ ঘু ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া । -া -া -া I -া -া -া । পা -ধা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তা ০ র্

I{ ধা -র্সা র্সা । -র্রা ^র্সা -া I র্সণা -া -া । ধা পা -া I
ম ০ নে র্ বে ০ দ০ ০ ন্ শ ত ০

[-া -া -া]
০ ০ ০

I পা -ধা ধর্সা । -ণা ধা -া I পা -া -া । পা -ধা -া} I
সু ০ রে০ ০ সু ০ রে ০ ০ তা ০ র্

I {পা -ধা ধা | -র্সা র্সা -া I র্সণা -া ণা | ধা পা -া I
কি ০ যে ০ ন ০ চা০ ০ হে মো রে ০

I (-া -া মা | -পা ধা -পা I ঁমা -া -া | মা মা -া I
০ ০ ব ০ লি ০ তে ০ ০ ও যে ০

I মা -া -পা | ধা -া -পা I ঁমা -া -া | -পা -মা -া I
ব ০ ০ লি ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০

I গা -া গা | -রা সা -া I ণ্ধা -া -া | -া -া -া I
ক ০ দ ম্ ত ০ লা০ ০ ০ ০ ০ য়্

I সা সা -রা | গমগা -া রসা I ঁরা -সা -া | {সা সা -া I
ও লো ০ ল০০ ০ লি০ তে ০ ০ বাঁ শী ০

I রা -া -পা | পা -া -ধা I পধপা -া -মা} | সা সা -া I
বা ০ ০ জা ০ য়্ কে০০ ০ ০ বাঁ শী ০

I রা -া -পা | পা -া -ধা I ধপা -া -মা | -া -া -া I
বা ০ ০ জা ০ য়্ কে০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | সা সা -া I সা -গা গা I -া ঁসা -া I
০ ০ ০ আ ছে ০ গো ০ কূ ল্ ন ০

I সরা -া -া | সা সা -া I রা -মা মা | -পা পধা -পা I
গ০ ০ র্ আ রো ০ ক ০ ত ০ না০ ০

৫৩

I মা -া -া | মা মা -া I মা -া মা | -ধা ধা -া I
রী ০ ০ ক ত ০ রূ ০ প ০ ব ০

I পধা -র্সণা -া | ধা পা -া I মপা -া -মা | পা পা -ধপা I
তী০ ০০ ০ বৃন্ দা ০ ব০ ০ ন্ কু মা ০০

I মা -া -া | গা মা -রা I ঽগা -া গা | -া রসা -া I
রী ০ ০ আ ছে ০ গো ০ কূ ল্ ন০ ০

I সরা -া -া | সা -া -া I -া -া -া | গা গা -া I
গ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ কে ন ০

[রগা -মা]
I {গা -া পমা | -া গরা -া I রা -া -জ্ঞমজ্ঞা | রা সা -া I
আ ০ মা০ ০ রি০ ০ না ০ ০০ম্ ল' য়ে ০

I ন্া -সা ন্া | -রসা ণ্া -া I ধ্া -া -া | (গা গা -া)} I
ব ঙ্ শী ০০ ধা ০ রী ০ ০ কে ন ০

ধ্া ণ্া -া I {রা -া রা | -া সা -া I রগা -মা -া | ঽগা রা -সা I
আ সে ০ নি ০ তি ০ নি ০ তি০ ০ ০ মো রে ০

I (-া -া সা | -রা মজ্ঞা -া I রসা -া -া | ধ্া ণ্া -া)} I
০ ০ ছ ০ লি০ ০ তে০ ০ ০ আ সে ০

I সা -া -রা | মজ্ঞা -া -রা I ঽসা -া -া | -া -া -া I
ছ ০ ০ লি০ ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -া -া -া I -া -া -া | পা পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স খী ০

[র্সা -না ধা -পা পা -ধা
I{ ধা -র্সা র্সা | -া র্সা -া I নর্সা -না ধণা | -ধা পা -া I
নি র্ ম ০ ল ০ কৃ০ ০ লে০ ০ মো র্

I ধা -র্সা র্সা | -া র্সর্রা -র্সা I র্সা -া -া | র্সা র্সা -া I
কৃ ষ্ ণ ০ কা ০ লি ০ ০ কে ন ০

I র্সা -া -র্সা | -র্রা -র্রা -া I (-া -া -া | -া -া -া I
লা ০ গা ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | র্রা র্রা -র্গা I র্সর্রা -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ কা লি ০ য়া০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | র্রা র্রর্গা -র্রা I র্গর্রা -া[র্স] র্সা | -া -া -া I
০ ০ ০ ব ন০ ০ মা০ ০ লী ০ ০ ০

I -া -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | পা পা -ধা)} I র্রা -া র্রা | -া র্রা -ধা I
০ ০ ০ স খী ০ কা ০ লি ০ য়া ০

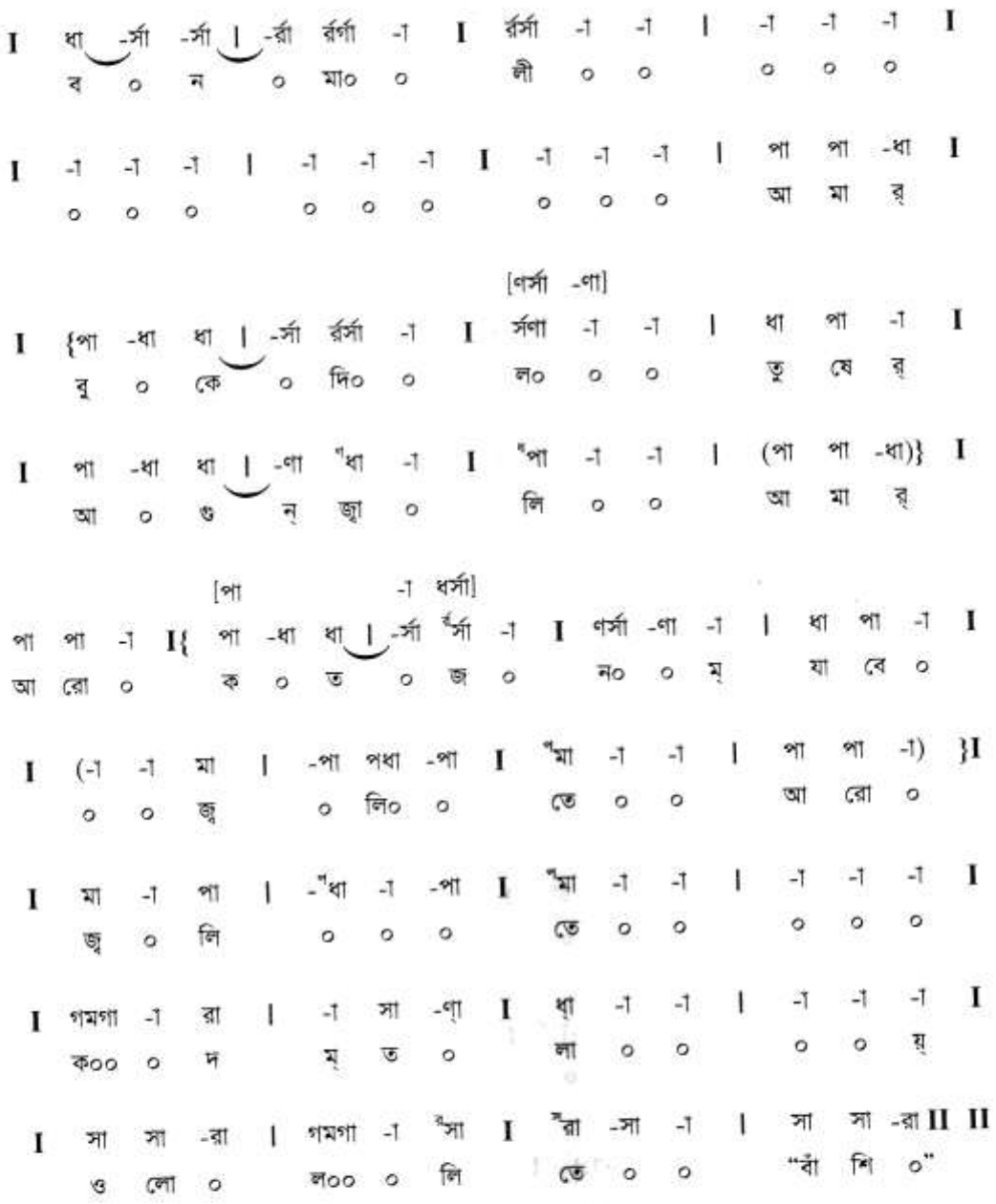

৫৬

উৎস-৫: *নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি* (দ্বিতীয় খন্ড), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪, পৃ ৫০-৫৬

১৩

"চোখ গেল চোখ গেল" কেন ডাকিস রে
চোখ-গেল পাখীরে
চোখ-গেল পাখী।
তোর ও চোখে কাহার চোখ পড়েছে নাকি রে
চোখ-গেল পাখী রে
চোখ-গেল পাখী ॥

চোখের বালির জ্বালা জানে সবাইরে
চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাইরে।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় তাহার আঁখিরে
চোখ-গেল পাখী রে
চোখ-গেল পাখী ॥

তোর চোখের জ্বালা বুঝি নিশি-রাতে বুকে লাগে
" চোখ গেল" ভুলে রে "পিউ কাঁহা' পিউ কাঁহা" ব'লে
তাই ডাকিস অনুরাগে রে।

ওরে বন-পাপিয়া কাহার গোপন্ প্রিয়া ছিলি
আর জনমে
আজো ভুলতে নারিস আজো ঝুরে হিয়া
ওরে পাপিয়া বল্ যে হারায় তাহারে কি
পাওয়া যায় ডাকি' রে।
চোখ-গেল পাখী রে
চোখ-গেল পাখী ॥

হিন্দুস্থান এইচ ৯৬৯ ॥ শিল্পী : কুমার শচীন দেববর্মণ ॥ ফিল্ম-সঙ্গীত ॥ তাল : দ্রুত দাদ্‌রা

II	^{ণ}ধণা	-া	-ধা	।	^{ণ}র্সা	পা	-া	I	^{ণ}ধণা	-া	ধা	।	^{ণ}র্সা	পা	-া	I
	চো০	০	খ্		গে	ল	০		চো০	০	খ্		গে	ল	০	

৭৬

I ণা -া ধপা | -া পা -া I পা -া -দা | দপা -মা -া I
কে ০ ন০ ০ ডা ০ কি ০ স্ রে ০ ০

I পদা -পা -মা | জ্ঞা সা -া I সা -া সা | -া ঁমা -া I
চো০ ০ খ্ গে ল ০ পা ০ খী ০ ০ ০

I মজ্ঞা -মজ্ঞা -া | রা সা -া I সা -া সা | -া -া -া I
চো০ ০০ খ্ গে ল ০ পা ০ খী ০ ০ ০

I -া -া -া | -া সা সা I পা -া পা | -দপা ঁমা -া I
০ ০ ০ ০ তোর্ ও চো ০ খে ০০ কা ০

I পা -া -দপা | ঁমা -া -া I পা -া পা | -দপা মা -া I
হা র্ ০০ চো ০ খ্ প ০ ড়ে ০০ ছে ০

I পা পা -দপা | মা -া -া I পদা -পমা -া | জ্ঞা সা -া I
না কি ০০ রে ০ ০ চো০ ০০ খ্ গে ল ০

I সা -া সা | -া সা -া I মজ্ঞা -মজ্ঞা -া | রা সা -া I
পা ০ খী ০ রে ০ চো ০০ খ্ গে ল ০

I সা -া সা | -া -া -া II
পা ০ খী ০ ০ ০

II পা -ণা র্সা | -র্রা র্জ্ঞা -র্রা I র্সণা -সর্ণা -া | পা মা -া I
চো ০ খে র্ বা ০ লি ০০ র্ জ্বা লা ০

I পা -ণা র্সা | -র্রা র্জ্ঞা -র্রা I র্সণা -র্সণা -া | পা -মা -া I
জা ০ নে ০ স ০ বা০ ০০ ই রে ০ ০

I পা -ণা ণা | -র্সা ^{স}র্রা -র্সা I র্সা -া -া | -া -া -া I
জা ০ নে ০ স ০ বা ০ ০ ০ ০ ই

I র্রজ্ঞা র্রা র্সা | -ধা পা -া I ধা -া -র্সা | র্রা র্জ্ঞা -া I
চো০ ০ খে ০ যা র্ চো ০ খ্ প ড়ে ০

I র্রর্জ্ঞা -র্রা র্সা | -ধা পা -া I -া ধা -র্সা | র্রর্গা -া -র্সা I
তা০ র্ ও ০ যু ধ্ ০ না ই রে ০ ০

I র্রা -র্গা র্গর্মা | -র্গা র্রা -র্সা I র্সা -া -া | -া -া -া I
তা র্ ও০ ০ যু ধ্ না ০ ০ ০ ০ ০

I ^{প}-া -া -া | -া -া -া I র্সা -া র্সা | -র্রা র্সা -ণা I
ই ০ ০ ০ ০ ০ কেঁ ০ দে ০ কেঁ ০

I ণা -ধা ধা | -পা পা ^{প}-া I ণা -ধা ধা | -পা পা -া I
দে ০ অ ন্ ধ ০ হ য় তা ০ হা র্

I পাঃ দঃ -া | দপা -মা -া I পদা -পা -মা | জ্ঞা সা -া I
আঁ খি ০ রে ০ ০ চো০ ০ খ্ গে ল ০

I সা -া সা | -া ^{প}মা -া I মজ্ঞা -মজ্ঞা -া | রা সা -া I
পা ০ খী ০ রে ০ চো০ ০০ খ্ গে ল ০

৭৮

I সা -া সা | -া -া -া II
পা ০ খী ০ ০ ০

সা -সা II রা -া মা | -পা ণা -া I পণা -পমা -া | রা সা -া I
তো র্ চো ০ খে র্ জ্বা ০ লা০ ০০ ০ বু ঝি ০

I সা -রা সন্া | -া সা -া I সগা -া -া | -া -া -া I
নি ০ শি০ ০ রা ০ তে০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা -মা পা | -ণা পা -মা I পমা -া -া | -া -া -া I
বু ০ কে ০ লা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

I পমা -া -ধা | ণা পা -া I ধপা -া পা | -মা মা -া I
চো০ ০ খ্ গে ল ০ ভু০ ০ লে ০ রে ০

I র্রা -া র্সা | র্রা র্সা -া I র্রা -া -র্সা | র্রা র্সা -া I
পি ০ উ কাঁ হা ০ পি ০ উ কাঁ হা ০

I ধণা -া পা | -ধপা মা -া I পা -া পদা | -া পদা -পা I
বো০ ০ লে ০০ তা ই ডা ০ কি০ স্ অ০ ০

I মপা -মা জ্ঞরা | -সা সা -া I জ্ঞরা -সা -া | -া -া -া I
নু০ ০ রা০ ০ গে ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | {না না -া I নর্সা -া র্সা | -া র্সা -া I
০ ০ ০ ও রে ০ ব০ ন্ পা ০ পি ০

I র্রর্সা -না -া | র্রা র্রা -র্মা I র্মা -র্গা র্গা | -র্রা র্রা -া I
য়া০ ০ ০ কা হা র্ গো ০ প ন্ প্রি ০

I র্রা -া র্রা | -জ্ঞর্রা র্রর্সা -া I ণর্সা -ণা ধপা | -মা পা -া I
য়া ০ ছি ০০ লি০ ০ আ০ র্ জ০ ০ ন ০

I পর্সা -া -া | -া -া -া I -া -া -া } | { র্সা র্সা -র্রা I
মে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জো ০

I র্সণা -া ধা | -গা পা -ধা I ধা -র্সা -ণা | ণা ণা -ধপা I
ভুল্ ০ তে ০ না ০ রি ০ স্ আ জো ০০

[পা দা]
I পা -া পধা | -ণধা পা -মা I মা -া -া } | পা পা -দা I
ঝু ০ রে০ ০০ হি ০ য়া ০ ০ ও রে ০

I {পদা -পা মা | -জ্ঞা সা -া I রসা -ণ্া -া | -া সা -া I
পা০ ০ পি ০ য়া ০ ব০ ০ ল্ ০ যে ০

I সগা -া পা | -রা গা -া I মা -া গা | মা -া -া I
হা০ ০ রা য়্ তা ০ হা ০ রে কি ০ ০

I পাঃ -ঃ ধা | ণাঃ -ঃ -র্সা I ণা -া ধা | ধণা -া -পা I
পা ও য়া যা ০ য়্ ডা ০ কি রে০ ০ ০

[-া -া -া]
I -া -া -া | (পা পা -দা)} I পদা -পা -মা | জ্ঞা সা -া I
০ ০ ০ ও রে ০ চো০ ০ খ্ গে ল ০

৮০

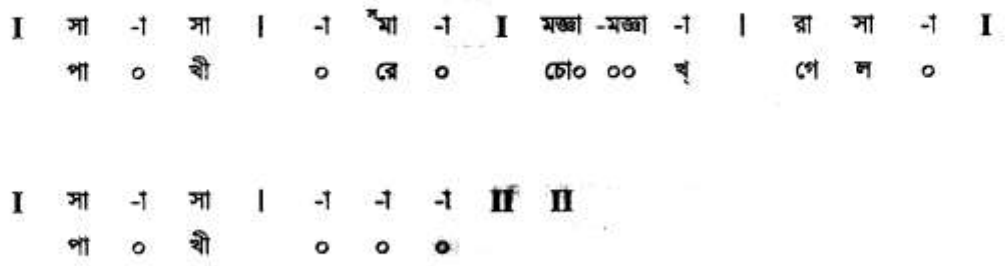

I	সা	-া	সা	।	-া	[স]মা	-া	I	মজ্ঞা	-মজ্ঞা	-া	।	ঋা	সা	-া	I
	পা	০	খী		০	রে	০		চো০	০০	খ্		গে	ল	০	

I	সা	-া	সা	।	-া	-া	-া	II	II
	পা	০	খী		০	০	০		

৮১

উৎস-৬: *নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি* (দ্বিতীয় খন্ড), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪, পৃ ৭৬-৮১

(৭)

২২

পদ্মার ঢেউরে —
মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা, যা রে।
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে ॥

মোর পরান-বঁধু নাই, পদ্মে তাই মধু নাই (নাই রে)
বাতাস কাঁদে বাইরে, সে-সুগন্ধ নাই রে
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি ঝংকারে রে ॥

ও পদ্মা রে —
ঢেউয়ে তোর ঢেউ উঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি
ঝিল্‌মিল্‌ করে কৃষ্ণ-কালো।

সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায়
যদি দেখিস তারে, দিস এই পদ্ম তার পায়
বলিস, কেন বুকে আশার দেয়ালী জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির-অন্ধকারে ॥

হিন্দুস্থান এইচ ৯৬৯ ॥ শিল্পী : শচীন দেববর্মণ ॥ পল্লীগীতি ॥ তাল : দ্রুত দাদ্‌রা

I -া -া সা | -া সা -া I
০ ০ প ০ দ্মা র্

II র্রা -া -মা | পা -ধা -া I -া -া -া | -া -া -ণধা I
ঢে ০ উ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

১০৮

I ণ-পপা ণ-মমা -া | -া -া -া I ধ-া -া -া | -া মা -পা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মো র্

I ধা -া ধর্সা | -ণা ণা -ধা I ধা -পা পা | -া পা -ণা I
শূ ন্ ন্য০ ০ হৃ ০ দ য় প ০ দ্ম ০

[পধা -ধণা -া]
I ণধা ধপা -া | পা -াঃ -ণঃ I ধ-পমা -গা গা | -মগা ণরা -সা I
নি য়ে০ ০ যা ০ ০ ০০ ০ যা ০০ রে ০

I -া -া সা | -া সা -া I ধরা -া -মা | পা -ধা -া I
০ ০ প ০ দ্মা র্ ঢে ০ উ রে ০ ০

I -া -া -া | -া -া -ণধা I ধ-পপা ণ-মমা -া | -া সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ এ ই

I সা -া রগা | -মগা -রসা -া I সা -রা রা | -গা গা -মা I
প ০ দ্মে ০০ ছি০ ০ ল ০ রে ০ যা র্

I রগাঃ -ঃ রসা | সা -া -া I -া -া -া | -া পা পা I
রা০ ০ ঙা০ পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

I ধা ধা -র্সা | র্সা র্সা -া I -া -া না | -র্সনা নধা -া I
হা রা ০ য়ে ছি ০ ০ ০ তা ০০ রে ০

I -ধনাঃ -ধঃ -পা | -া -া -া I -া -া -া | -া পা পা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

Dhaka University Institutional Repository

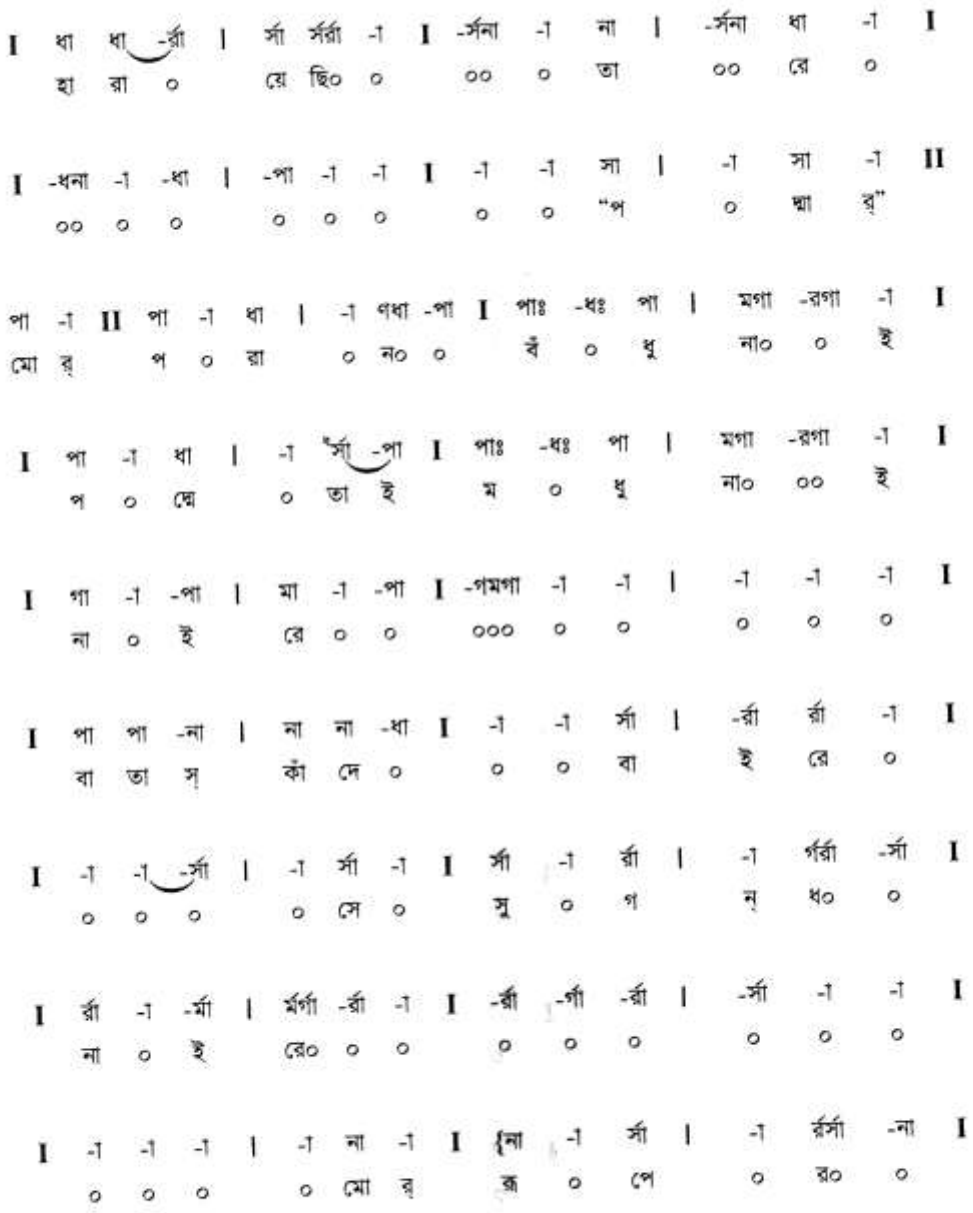

১১০

I না ধপা -া | $^{\text{ন}}$না -া না I র্সা -া র্সা | -া র্রর্সা -না I

স রo o সী o তে আ o ন ন্ দo o

I নর্সা -নধা -পা | $^{\text{ন}}$না না -া} I র্সা -া নর্সা | -র্রা $^{\text{র}}$র্সা -া I

মৌo oo o মা ছি o না o হিo o ঝং o

I ণধা -পা -া | ণধা -পা -া I ণধা -পা $^{\text{প}}$সা | -া সা -া II

কাo o o রেo o o রেo o "প o দ্মা র্"

সা -া II সা -া মা | মা -া -পা I $^{\text{প}}$-মা -গা -া | -া -া $^{\text{স}}$-া I

ও o প o দ্মা রে o o o o o o o o

I গমা -গা রা | -সা সা -া I সরা -া -সণ্া | সা সা -া I

ঢেo উ য়ে o তো র্ ঢেo o oউ উ ঠা য়্

I মা -া মপা | -া পধা -পা I মপা -মা জ্ঞমা | -জ্ঞা রা -সা I

যে o মo ন্o চাঁo o দেo o রo o আ o

I সা -া -া | -া -া -া I পা -ধা ধা | -ণধা পা -া I

লো o o o o o মো র্ বঁ oo ধু o

I পধা -া -া | -ণধা -পা -া I পা -ধা ধর্সা | -ণা ধপা -া I

য়াo o o oo o র্ রূ প্ তেo o মo o

I পধা -া -পা | -মা -া -া I মা -পা পা | -ধা ধণা -ধা I

নিo o o o o o ঝি ল্ মি ল্ কo o

১১১

Dhaka University Institutional Repository

I	পমা	-া	-গা	I	-া	-রসা	-া	I	সা	-রা	রা	I	-মজ্ঞা	রা	-সা	I
	রে০	০	০		০	০০	০		কৃ	ষ্	ণ		০০	কা	০	
I	সা	-া	-া	I	-া	না	-া	I	{না	-র্সা	র্সা	I	-া	র্সা	-া	I
	লো	০	০		০	সে	০		প্রে	০	মে		র্	ঘা	০	
I	নর্সা	-নধা	-পা	I	না	না	-া	I	-া	-া	র্সা	I	র্রা	র্গর্রা	-র্সা	I
	টে০	০০	০		ঘা	টে	০		০	০	বাঁ		শি	বা০	০	
														[না	না]	
														য	দি	
I	র্সর্রা	-র্গা	-া	I	-া	-া	-া	I	-র্রর্মা	-র্গা	-র্রর্সা	I	-া	(না	-া)}	I
	জা০	০	০		০	০	০		০০	০	০০		য়	সে	০	
I	না	-র্সা	র্সা	I	-া	র্সা	-া	I	র্রর্সা	-না	না	I	ন-র্সা	র্সধা	-নধা	I
	দে	০	খি		স্	তা	০		রে০	০	দি		স্	এ	ই০	
I	পা	-ধা	মা	I	-ধা	ধা	-পা	I	পা	-া	-া	I	{পা	পা	-ণা	I
	প	দ্	ম		০	তা	র্		পা	০	য়		ব	লি	স্	
I	ধণা	-া	ণা	I	-ধা	ধা	-া	I	পপা	-মা	পা	I	-া	পা	-ণা	I
	কে	০	ন		০	বু	০		কে	০	আ		০	শা	র্	
I	ধণা	-ধা	পধা	I	-পা	মপা	-মা	I	জ্ঞরা	সা	-া	I	রসা	-ণ্া	-া	I
	দে০	০	য়া০		০	লী০	০		জ্বা০	লি	০		য়ে০	০	০	

১১২

I সা -া সগা | -া গা -া I গমা -া পা | -দা পা -া I

ফে ০ লে০ ০ গে ০ ল০ ০ চি ০ র ০

I মপা -মা জ্ঞমা | -জ্ঞা ^র্সরা -া I র্সা -া -া | -া -া -া I

অ০ ন্ ধ০ ০ কা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া সা | -া সা -া II II

০ ০ "প ০ ন্না র্"

১১৩

উৎস-৭: *নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি* (দ্বিতীয় খন্ড), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪, পৃ ১০৮-১১৩

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১। ড. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতিঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন* (১ম খন্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৭

২। আবদুস সাত্তার, *নজরুল সংগীত অভিধান*, নজরুল ইন্সটিটিউট, , ধানমন্ডি, ঢাকা, ২৫ মে ১৯৯৩

৩। বাবু রহমান, *'মুকুন্দ দাস ও কাজী নজরুল ইসলাম' (প্রবন্ধ)*, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা (নববর্ষ ২য় সংখ্যা, শীত-বসন্ত) ১৩৯৩ (বাং)

৪। ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *বেতারে নজরুল ও তাঁর গান*, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা ১৯৯৮

৫। করুনাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৌষ ১৩৮৪

৬। আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০০

৭। অনুপম হায়াত, *নাট্যাঙ্গনে নজরুল*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা চৈত্র ১৪০৩

৮। ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান*, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমী, নভেম্বর ১৯৯৫

৯। মাফরুহা হোসেন সেঁজুতি, *নজরুল সংগীতে লোকউপাদান*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০১৭

১০। আসাদুল হক, *নজরুল সংগীতের রূপকার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, শ্রাবণ ১৩৯৭

১১। *নজরুল সংগীত স্বরলিপি*- নজরুল ইন্সটিটিউট

১২। আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০০

১৩। *বাংলা বানান অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, অষ্টম পুনমুদ্রণঃ শ্রাবণ ১৪২৬

১৪। রশিদুন্ নবী, *নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩

১৫। করুনাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৯১

১৬। রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃজন*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪১৫

১৭। সংগীত শেকড়-Roots of Music, *আন্তর্জাতিক বাংলা সংগীত কেন্দ্র (ICBM)*, নভেম্বর, ২০২০

১৮। ড. ব্রহ্মহমোহন ঠাকুর, *নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬

১৯। আব্দুল আজীজ আল-আমান এম.এ., *নজরুল গীতি (অখন্ড)*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ৪ জুন ১৯৯৯

২০। নারায়ণ চৌধুরী, *নজরুল চর্চা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

২১। রশিদুন্ নবী, *আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত নজরুল সঙ্গীতের বাণী*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০২

২২। *নজরুল শব্দকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০০

২৩। অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্র জগতে নজরুল*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আশ্বিন ১৪০৫

২৪। ওয়াকিল আহমেদ, *নজরুল- লেটো ও লোকসাহিত্য*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, এপ্রিল ২০০১

২৫। মোবারক হোসেন খান, *নজরুল সংগীতের বিচিত্র্যধারা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৫